কৌমুদী

৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, বি. এ.

প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী,

পাটুয়াটুলী, ঢাকা

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

১৩৩৪

মূল্য ৸৵০ আনা।

ভূমিকা

যে মনীষার সমুজ্জ্বল ভাবসম্পূট বক্ষে লইয়া আজ পিতৃহীনা কন্যার মত 'কৌমুদীর' জন্ম, তার জন্মদাতা, সমগ্র লোক-লোচনের আনন্দ প্রদীপ, সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদচন্দ্র আজ কোথায়! এ প্রশ্নের উত্তর লইয়া আজ প্রতিধ্বনি কোথাও জাগে না, সে আজ সুসঙ্গের ঘন-নীল শৈল-মালার স্তরবিন্যস্ত পাষাণবক্ষে অনাদিকালের জন্য নিরুত্তর! তাঁরি পিতৃ-পুরুষের বাহুবললব্ধ দশভূজার মন্দিরতলে সে সম্বন্ধে কোন ধ্রুব দৈব-বাণীও শ্রুত হয় নাই। যে অশোককুঞ্জের শূন্য ছায়াতলে সুসঙ্গের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সুদূর অতীতের সঙ্গে জড়িত, তার পত্র-মর্ম্মরেও, "মহা-সিন্ধুর ওপার হ'তে" কুমুদচন্দ্রের কোন অমৃতবাণী আজ ভাসিয়া আসে নাই যে সোমেশ্বরী সুসঙ্গের ঐতিহাসিক রাজবংশের আদি-পুরুষের নাম লইয়া প্রবাহিত, তারি শূন্য-ধূসর তটপ্রান্তে, তাঁর পূজ্য পিতৃপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতির সহিত, কুমুদচন্দ্রের অন্তিম স্মৃতির সবটুকু বেদনা মিলিত হইয়া, নদীর কলস্বরে, অনন্ত কালের জন্য, কি সকরুণ বিদায় সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।

"যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,—
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী—
স্তম্ভিত হ'য়ে রও!"

২। মহারাজ কুমুদচন্দ্রের জন্ম ও মৃত্যুর ভিতরে সুসঙ্গের বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাসের ধারা প্রচ্ছন্ন। সুসঙ্গের সুদীর্ঘ রাজ-লীলার অবসান-মুখে, মহারাজ কুমুদচন্দ্রের পার্থিব জীবন-শাখাটী আশ্রয় করিয়া, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত, সুসঙ্গের রাজনীতি বুঝি শেষবারের মত অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু সে কথা এখন থাক। সুসঙ্গের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস বা কুমুদচন্দ্রের ঘটনা-বহুল জীবন-কাহিনী 'কৌমুদীর" অপ্রশস্ত ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ কোথায়?

৩। কুমুদচন্দ্রের কয়েকটীমাত্র প্রবন্ধ চয়ন করিয়া আজ 'কৌমুদী প্রচারিত হইল। পুস্তকের নাম **কৌমুদী**, ইহাও স্বর্গীয় কুমুদচন্দ্রের ইচ্ছানুমোদিত। সুসঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রচন্দ্র—স্বর্গীয় মহারাজের সুযোগ্য পুত্র 'কৌমুদীর' ভূমিকা লিখিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু রাজকার্য্যের বাহুল্যবশতঃ এ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আমার যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।* সেই জন্যই এতদিন, মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্রের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 'কৌমুদী' আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। আজ হয়ত কুমুদচন্দ্রের মৃত্যু-ক্ষণে শারদীয় বোধন ষষ্ঠীর ম্লান জ্যোৎস্নালোকে, কুমুদচন্দ্রের পুণ্য জীবনের স্মৃতি স্মরণ করিয়া র' ভূমিকা রচনা করিবার সময় অদৃশ্য ভবিষ্যতের গর্ভে এতকাল নিহিত ছিল। তাই আজ 'কৌমুদীর' আবির্ভাব।

৪। কুমুদচন্দ্র বিখ্যাত রাজবংশে ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়াও আজীবন বিলাস-বিমুখ ছিলেন। বিষয়ভোগে আশক্তি লইয়া যদি তিনি লৌকিক কর্ম্ম-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে শিক্ষা,

চরিত্র ও প্রতিভা বলে আজ তিনি উজ্জ্বলতর লোক-যশঃ এবং শ্রেষ্ঠতর রাজসম্মান লাভ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়ভোগে তাঁর কিছুমাত্র আন্তরিক স্পৃহা ছিল না। তাই এত বড় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি অনেকটা অসংসারী ছিলেন। ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া ত্যাগ ও সংযমের পথ দিয়া তাঁর ভিতর যে মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তার সম্মুখে যশের স্পৃহা তুচ্ছ—অতি-তুচ্ছ! ঋত্বিকের মন্ত্রপূত হোমশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল, এক অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্য শ্রী তাঁর সুমধুর চরিত্রটী চিরকাল উজ্জল করিয়া রাখিয়াছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তাঁর অখণ্ড মানবজীবন বিদ্যার্থীভাবে জ্ঞানালোচনায়ই সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তার আজন্ম জ্ঞান-সাধনার ফল যদি সাহিত্যের কমলা-ভাণ্ডারে উঠিত, তবে হয়ত তিনি আমাদের বাংলা ভাষাকে অনেক গুপ্ত-ধনের সন্ধান দিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু কুমুদচন্দ্র তাঁর জ্ঞান-চর্চ্চার পরিণত ফল লোকসমাজে প্রচার করিতে বড়ই কুণ্ঠিত ছিলেন। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এ তপোনিষ্ঠ-সাধকের মৌনব্রত ভঙ্গ করিতে পারি নাই। যাঁরা কুমুদচন্দ্রের স্বাভাবিক বিনয়নম্র শান্ত নিরভিমান চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত, তাঁদের নিকট তাঁর আত্মপ্রচারে এই কুণ্ঠার কারণ নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যক বোধ করি না।

৫। মহারাজ কুমুদচন্দ্র ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-পুঞ্জের তরুণ আভায় তখন ভারতের পূর্ব্বাকাশ সবে অনুরঞ্জিত

হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কুমুদচন্দ্রও বিজ্ঞান ও গণিতের রক্ত পতাকা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীমন্দির হইতে সসম্মানে বাহির হইয়াছিলেন। গণিত ও বিজ্ঞানের ছাত্র হইয়াও তিনি ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমার মনে আছে, ঢাকার তৎকালীন কমিশনার মিঃ এইচ, এম্, কিস্ সাহেব মহারাজের সহিত আলাপ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহারাজ আপনি এরূপ শুদ্ধ ও সুন্দর ভাষায় ইংরেজী কোথায় শিক্ষা করিয়াছেন? এদেশে এরূপ বিশুদ্ধ ইংরেজী ও চমৎকার উচ্চারণ আমি খুই অল্পই শুনিয়াছি।"

৬। কলেজেই মহাকবি কালিদাসের কাব্যের সহিত কুমুদচন্দ্রের পরিচয় ঘটে! যে কাব-ঝঙ্কার তার "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিয়া তাঁর কর্ণে যে মধুবর্ষণ করিয়াছিল, তারি ফলে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র-জলধি মন্থন করিয়া অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কেবল সংস্কৃত সাহিত্য নয়—তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্যের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত আলোচনাই তাঁহার জীবনকে আশ্চর্য্য বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। কেবল কথোপকথন নয়—বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতাও দিতে পারিতেন। সংস্কৃত কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণশাস্ত্রের অসংখ্য শ্লোক তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। পুনা, প্রয়াগ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর, আহাম্মদাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি যে কোন স্থানে কোন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইত, তাহা পাঠ না করা পর্য্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না। প্রত্যহ দিনের অধিকাংশ সময় তাঁর এই সাহিত্য

আলোচনার ভিতর দিয়াই কাটিয়া যাইত। সুসঙ্গে কুমুদচন্দ্রের বসিবার ঘরে কাচের দীপাধারে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোর চারিদিকে প্রতি সন্ধ্যায় বিনা অনুষ্ঠানে আমাদের যে সাহিত্য সভা বসিত তার প্রাণ ছিলেন মহারাজ কুমুদচন্দ্র। সেখানে ভাব ও ভাষার মৃদু স্বপ্নালোকে, সাহিত্যের চিরশ্যামল পত্রপুষ্পের ভিতরে আমরা বাণীর যে ধ্যানমুর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম, তাঁকে আমরা এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। কুমুদচন্দ্রের সহিত আজ সুসঙ্গের সে শেফালির মদির আবেশমাখা সান্ধ্য সভা ও সাহিত্যস্বপ্নের চির অবসান হইয়াছে। চন্দ্রভুনির সে সুকণ্ঠ পাপিয়ার স্বর আজ চিরকালের জন্য নীরব—চন্দ্রভুনির ছবির সহিত কুমুদচন্দ্রের বিদায়স্মৃতি জড়িত হইয়া উঠিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত মনে হয়,—"আর কি ব্রজ তেমন পাব!"—সে সুসঙ্গ কি আর তেমন আছে।"

৭। মানুষ নিজের জীবন-পথে যতটুকু নিখিল সত্যের আভাস পায়, এবং সাহিত্য প্রচেষ্টার ভিতরে তাহা যতটা পরিস্ফুট করিয়া তুলে, ততটুকুই তার সাহিত্য সাধনার প্রাণ। প্রাণের গভীর সত্যের অনুভূতি আবার মানুষের জীবন স্মৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই গ্রন্থকারের জীবন-স্মৃতির আলোচনার সাহিত্য জগতে একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। কুমুদচন্দ্রের সাহিত্যনিষ্ঠা ও জ্ঞান অনুশীলনের কথা বাংলা সাহিত্য জগতে অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং সম্পাদকীয় দৌরাত্ম্য যখন নিতান্ত অনতিক্রমনীয় হইয়া উঠিত তখন কুমুদচন্দ্র তাঁহাদিগকে ২।৪টী প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়া তুষ্ট করিতেন। বাংলা সাময়িক পত্রেই এইভাবে কুমুদচন্দ্রের সাহিত্য আত্মপ্রকাশ

করে। বান্ধব, আরতি, সৌরভ, সাহিত্য-সংহিতা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে সময় সময় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। কৌমুদীতে যে কয়টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, তা ছাড়া কুমুদচন্দ্রের ব্রাহ্মণ, হস্তি প্রসঙ্গ, দুগ্ধ, প্রাচীন ভারতে পশুচিকিৎসা প্রভৃতি সারগর্ভ চিন্তাশীল কয়েকটী প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল।

৮। তা-ছাড়া কলিকাতা সাহিত্য সভার সংশ্রবে আসিয়া উক্ত সভার সভাপতিরূপে কুমুদচন্দ্র যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহারও কয়েকটী 'কৌমুদীতে' সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুসঙ্গের রাজা—রাজসিংহের লিখিত ভারতীমঙ্গল কাব্য-খানাও সম্পাদন করিয়া কলিকাতা সাহিত্য পরিষদের যোগে তাহা বঙ্গ সাহিত্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ১৩০৮ সনের ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে কুমুদচন্দ্র যে সুন্দর প্রবন্ধটী সুললিত ভাষায় পাঠ করেন, তার ভাবসম্পদ ও ভাষার ঝঙ্কার সমস্ত বিজ্ঞজন-মণ্ডলীর চিত্ত পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। সর্ব্বশেষে, কলিকাতা ব্রাহ্মণ মহা-সম্মিলনার সভাপতিরূপে যে জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর্য্য সভ্যতার বিশিষ্টতা রক্ষাকল্পে বাঙ্গালার মৃতপ্রায় ব্রাহ্মণ সমাজকে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পন্থার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বর্ণাশ্রম পুনর্জ্জীবিত করিয়া জগতের গুরু স্থান অধিকার করিবার জন্য যে সমুদয় যুক্তি-তর্ক ও শাস্ত্রের প্রমাণ অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অনেক চিন্তনীয় বিষয় পাওয়া যাইবে একথা অস্বীকার করিবার যো নাই।

৯। বাঙ্গালা ভাষার মাতৃ-স্বরূপা সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা মাত্র পল্লবগ্রাহী জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। সংস্কৃত শিক্ষাকে অঙ্গহীন না করিয়া সুশিক্ষার পন্থা আবিষ্কৃত হইলে বাংলা সাহিত্য ভাব ও ভাষা সম্পদের সহিত গভীর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে। 'সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক প্রবন্ধে কুমুদচন্দ্র শিক্ষিত বাংলাকে এই কথাটা সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "আমাদের কোন পন্থা অবলম্বনীয়" নামক প্রবন্ধে তিনি আমাদিগকে পাশ্চাত্য বিষ স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া দেশকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়া, ত্যাগের মহিমা-মণ্ডিত জ্ঞানোজ্জ্বল আর্য্য সংসার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিযাছেন। "চিতা ও চিন্তায়" দেশে অন্নচিন্তা ও অর্থচিন্তার বিভীষিকা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমাদের দেহ মনের কঙ্কালমূর্ত্তির সম্মুখে পাশ্চাত্য জ্ঞানের স্বচ্ছ কাঁচাবরণে ঋষির জ্ঞানোজ্জ্বল বর্ত্তিকা স্থাপন করিয়া জগতে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য জলদগম্ভীর স্বরে আহ্বান করিয়াছেন। 'ভারতীয় কবি ও চিত্রকর' নামক সন্দর্ভে তিনি চিত্রশিল্পকে দেশীয় প্রাচীন আদর্শে পুনরুজ্জীবিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া পুরস্ত্রীসমাজে যাহাতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়, তাহার জন্য দেশকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে চিত্তরঞ্জিনী বিদ্যা ললিতকলার চতুঃসীমা লঙ্ঘন করিয়া বহুদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, "প্রাচীন ভারতে চতুঃষষ্টি কলাবিজ্ঞান' কুমুদচন্দ্র তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিত্র বাঙ্গালা সমাজে উন্মুক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদের বঙ্গানুবাদ ও সুসঙ্গের রাজবংশের

একখানা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার কামনা কুমুদচন্দ্রের জীবনে ফলবতী হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তিনি মহাকবি ভাসের গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সে ইচ্ছাও কুমুদচন্দ্র এবারকার মত অসম্পূর্ণ রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছেন।

১০। কুমুদচন্দ্রের বিশেষত্ব সুসঙ্গের রাজপরিবারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের দিক দিয়া নয়, সুসঙ্গের রাজকুলের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বলিয়াও নয়, তাঁর লোকমান রাজ-সম্মান, মহত্ত্ব বিশেষত্ব সকলি তাঁর জ্ঞানমণ্ডিত অকলঙ্ক চরিত্রের মধ্যে বিকশিত মনুষ্যত্বের উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কুমুদচন্দ্রের আত্মজীবনের মর্ম্মকথা ও তার রচিত সাহিত্যের ভিতরের কথা—সমন্বয় ও সামঞ্জস্য, ধ্বংসের সংঘর্ষ নয়। তার চিন্তা রাজ্যে নিজ প্রতিভার দীপ্ত আলোকে দূর হইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সামঞ্জস্য লাভ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সকল প্রবন্ধের অন্তরাল হইতে অনাহত প্রণবধ্বনির মত যে একটী গভীর সত্য ধ্বনিত হইয়াছে তাহা প্রতীচ্য জড় বিজ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মজ্ঞানের সমন্বয় সাধন। ভারতকে পুনরায় জগতের পূজ্যস্থান অধিকার করিতে হইলে আমাদিগকে প্রেয়ের পথ দিয়া শ্রেয়ের পথে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। ভোগমুখী সভ্যতার ঐশ্বর্য্য ও ত্যাগমুখী সভ্যতার মহিমা দৃশ্যতঃ পরস্পর বিরোধী হইলেও উভয়েই পূর্ণ সত্যের ভগ্নাংশ মাত্র। এই দুই এর সামঞ্জস্যের উপর আজ ভারতের পূর্ণতা নির্ভর করিতেছে। ভোগের অতৃপ্তি মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে পূর্ণতার দিকেই প্রেরণ করিবে। কুমুদচন্দ্রের দৃষ্টিতে দেশের যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বর্ণ বিদ্বেষে বিষাক্ত হইয়া উঠে নাই। তাহার

ভিতরে কোথাও হিংসা বা সংঘর্ষের ধ্বংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে নাই। এক সার্ব্বজনীন সামঞ্জস্যের উপর সমগ্র মানবমণ্ডলাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ভারতের মুক্তিমন্ত্রে ভোগলুব্ধ জগতের জ্ঞানচক্ষু উন্মালন করিবার দিকেই কুমুদচন্দ্র চিত্তবৃত্তি ধাবিত হইয়া দেশ বিদেশের ভেদরেখা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাই কুমুদচন্দ্র তাঁর দেশবাসিগণকে এই মহামানবতার শিখরে আরোহণ করিয়া জাতি বর্ণ ও লোক নির্ব্বিশেষে পৃথিবার সর্ব্বত্র আত্মীয়তা স্থাপন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে আমাদের ঋষি ভারতের প্রোজ্জ্বল দাপবর্ত্তিকা ব্যতীত আর কি সম্বল আছে? ইহা লইয়াই ত ব্রহ্মচারা বিবেকানন্দ জগতসভায় বরণীয় শিক্ষাগুরুর পদ লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাই কুমুদচন্দ্র বলিয়াছেন, আর্য্যধর্ম্মকে কালোচিত পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন কর ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাকে একেবারে বর্জ্জন করিলে কি করিয়া আর্য্য সভ্যতার বিশিষ্টতা রক্ষা করিবে? যে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ জ্ঞানবলে আর্য্য-সভ্যতাকে ব্রহ্মচৈতন্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, পতিত ভারতে আবার সেই আর্য্য সভ্যতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতকে তার শিষ্যত্বে বরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা যদি কর্ত্তব্য বোধ কর তবে সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমানের পতিত ব্রাহ্মণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর। নচেৎ চিরন্তন ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া বিশিষ্টতাবর্জ্জিত আর্য্য সভ্যতা কখনো পাশ্চাত্য শক্তির সংঘাত সহ্য করিতে পারিবে না—ইহাই কুমুদচন্দ্রের বাণী—তাঁর রচিত সাহিত্যের চেতনাও এই বাণীর ভিতরেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। ইহা শুধু মহারাজ কুমুদচন্দ্রের বাণী নয়—মহাপুরুষেরা সকলেই প্রায় এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া

গিয়াছেন। কুমুদচন্দ্রের বাণী অলীক স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, কি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে সার্থকতা লাভ করিবে, তা সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর ব্যতীত কে বলিতে পারে ?

ইদ্রাকপুর কেল্লা
মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা
বোধনষষ্ঠী ১৩৩১

সুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা—

নিবেদন।

পিতৃদেব এক সময়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইলেই সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল বলিয়া যাইতে থাকিতেন। বস্তুতঃ কোনও সাহিত্যিক এসময়ে উপস্থিত থাকিলে সাহিত্যালোচনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। সেই সময়ে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি "কৌমুদী" নাম দিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিলে ভাল হয়। সমস্তগুলি প্রবন্ধ এখনও আমি প্রাপ্ত হইনাই; যাহা পাইয়াছি, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ করিয়া পিতৃদেবের বাসনা আংশিক পূর্ণ করিলাম। ভবিষ্যতে সকল প্রবন্ধই প্রকাশিত করিয়া কৃতার্থ হইবার বাসনা রহিল। এ বিষয়ে যদি কেহ আমাকে সাহায্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

এই পুস্তক প্রকাশ করিবার সময় ময়মনসিংহের সুপরিচিত, একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় যে পরিমাণ সহায়তা করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি সর্ব্বথা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন।

সুসঙ্গ—
২১শে জৈষ্ঠ।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (শর্ম্মা)
সুসঙ্গ।

সূচীপত্র।

কৌমুদী

আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বনীয় ?

ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে এবং সমষ্টি ভাবে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এমন একটা সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তখন স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তি হয়—ভোগেই সুখ অথবা ত্যাগেই সুখ ? বর্ত্তমান কালে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই প্রকার জিজ্ঞাসার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল মন্ত্র—"জ্ঞানই শক্তি" (Knowledge is power) এবং ভারতবর্ষীয় (প্রাচ্য) শিক্ষার মূল মন্ত্র—"জ্ঞানই মুক্তি।" পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিতেছেন—এই শক্তি লাভের উদ্দেশ্য—নিত্য নূতন অভাব কল্পনা করতঃ তাহা পূরণের চেষ্টা। এক কথায় বলিতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষা পার্থিব ভোগ মূলক এবং ভারতীয় আর্য্য শিক্ষা ভোগ বাসনা ত্যাগ মূলক। ত্যাগের দৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিতেছেন—"ভোগেই সুখ" এবং

প্রাচ্য শিক্ষা বলিতেছেন—"ত্যাগেই শান্তি এবং তাহাতেই সুখ," "ত্যাগাচ্ছান্তিঃ", এবং "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্।" মানবের সুখ ও শান্তি দুইটী বিভিন্ন অবস্থা। অনেকেই পার্থিব ভোগ বিলাসে সুখী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে শান্তি লাভ না-ও ঘটিতে পারে। বাস্তবিক সুখ অপেক্ষা শান্তি যে অধিকতর স্পৃহনীয়, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। প্রচলিত কথায়ও বলা হয় যে, "সুখ অপেক্ষা শোয়াস্তি ভাল।" ভোগদ্বারা ক্রমে ভোগবাসনা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়, তাহাতে শান্তি লাভের আশা সুদূরপরাহত।

"কামঃ কামোপভোগেন ন যাতি সাম্যতাং,
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে।"

বাসনা ক্ষয় করিতে না পারিলে শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই, এবং বাসনা ক্ষয় দ্বারাই মুক্তি লাভের আশা করা যায়। ইহাই ভারতবর্ষীয় ঋষিগণের প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত মত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা বর্ত্তমান সময়ে কোন্ পন্থা অনুসরণ করিব? ভোগের পথ, কি ত্যাগের পথ? জড় বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সহকারে পাশ্চাত্য জাতিগণ জগতের উপর প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন এবং পার্থিব ভোগ লালসার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইতেছেন। আমরা পাশ্চাত্য অধানে থাকিয়া ক্রমশঃই ভোগ বিলাসী হইতেছি এবং ত্যাগের মাহমাও ধীরে ধীরে বিস্মৃত হইতেছি। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের কতকগুলি উপপত্তি (Theory) কণ্ঠস্থ করিয়াছি বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ করিয়া বিদ্যার সাফল্য প্রতিপাদন করিতে পারিতেছি না। এই অবস্থা যে তাদৃশ বাঞ্ছনীয় ও প্রকৃত উন্নতির পরিচায়ক নহে, এ কথা বোধ হয় কোনও বিবেচক

ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। সত্য বটে আমরা অধুনা শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিতেছি, তাহাতে কিছু সাফল্যও লাভ করিতেছি, কিন্তু তাহা প্রচুর নহে।

আমার সন্দেহ হয়, আমরা ক্রমে—"শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ" এই দুই পথ হইতেই ভ্রষ্ট হইতেছি। সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে না পারিলে আমরা "ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ" হইবই। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিতে পারে, একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, কিন্তু কল্যাণময়ী শ্রুতি বলিতেছেন যে, এমন পদার্থ অবগত হও যাহা জানিতে পারিলে জগতে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহা কি? "আত্মা" বা "ব্রহ্ম"। শ্রুতি বলিতেছেন, "আত্মা বা অরে মন্তব্যঃ শ্রোতব্যো নিধ্যাসিতব্যশ্চ, তস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিদিতং স্যাৎ এবং ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"; উপনিষৎ বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্" এবং ইহাও বলিতেছেন যে—বিদ্যা দুই প্রকার, অপরা ও পরা। ঋগ্‌বেদাদি (কর্ম্মকাণ্ড) ও অন্যান্য শাস্ত্র (শিল্প প্রভৃতি) "অপরা" এবং জ্ঞান-কাণ্ড (ব্রহ্মবিদ্যা) পরা। পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে "যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় তাহাই পরা"।

আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ততই তাহা ভারতের ব্রহ্মবিদ্যার সন্নিহিত হইবে। আমরা দেখিতে পাইতেছি—পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ এখন যেন কেবল মাত্র জড় বিজ্ঞানের আলোচনায় তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতে-ছেন না! বোধ হয় তাঁহারা যেন কতকটা শান্তির অনুসন্ধানে স্পৃহাবান হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকের লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করিতে

ইচ্ছা হয় যে, আজকাল সমগ্র পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী ভারতের আধ্যাত্ম বিদ্যা লাভের জন্য লালায়িত হইতেছেন এবং অচিরে সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ ভারতীয় ঋষিচরণে প্রণত হইবেন। এবং সেই দিনই ভারতের প্রকৃত গৌরব-রবি পাশ্চাত্য গগনে উদিত হইয়া ভাস্বর দীপ্তিতে শোভামান হইবেন।

সৌভাগ্য ক্রমে হিন্দুর নিকট এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং প্রাচ্য জ্ঞানের দ্বার সমভাবে উন্মুক্ত। ইচ্ছা করিলেই এখন হিন্দু উভয় রত্ন-ভাণ্ডার হইতে প্রভূত রত্নসম্ভার আহরণ করতঃ ভারত-মাতার শিরোভূষণে স্তরে স্তরে সজ্জিত করতঃ তাঁহাকে জগতের সমক্ষে মহিয়সী সম্রাজ্ঞীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

আমার বোধ হয়, হিন্দুই জগৎকে সভ্যতার পূর্ণ মূর্ত্তি দেখাইতে পারিবেন। কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন তাঁহা দ্বারাই সহজে সাধিত হইবার আশা আছে। বর্ত্তমানে এই শুভচেষ্টার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অবহেলায় হারাইলে আমাদিগকে পরিণামে অনুতপ্ত হইতে হইবে। আমাদের পিতৃপুরুষের সযত্ন রক্ষিত রত্ন-ভাণ্ডারে যে সমস্ত রত্ন বিরাজিত আছে, তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা আমরা যেন বুঝিতে পারিতেছি না এবং ঘরের লক্ষ্মীকে যেন আমরা পদাঘাতে বিদূরিত করিতেছি।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে কতকটা পরপ্রত্যাশী হইয়াছি। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। আমাদের ধীশক্তি কতকটা ক্ষীণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, কারণ এখনও বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা আমাদের

দেশে জন্মগ্রহণ করিতেছেন। এই মহাত্মা নিজের উদ্ভাবিত অভিনব বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ভারতের সনাতন শ্রুতিবাক্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" কেবল মাত্র দার্শনিক কল্পনা নহে; ইহা বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জ্বলন্ত সত্য। এই মহাত্মা অধুনা বহু গবেষণা দ্বারা অভিনব যন্ত্র সাহায্যে ইহাও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীব-জগতের ন্যায় উদ্ভিদ্ জগৎও প্রাণ বিশিষ্ট এবং তাহাদেরও সুখ দুঃখানুভূতি আছে; বলিতে আনন্দ বোধ হয়, মহর্ষি মনু বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ"। আমার পুনঃ পুনঃই বলিতে প্রবৃত্তি হয় যে, পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে ভারতীয় ঋষির যোগলব্ধ জ্ঞান সমস্তই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে এবং ঋষিগণ যে বাস্তবিকই ত্রিকালদর্শী ছিলেন ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—হিন্দু সন্তান যেন মোহান্ধ হইয়া একেবারেই পাশ্চাত্য বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া না যান।

সত্য বটে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক অভিনব বিষয় শিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের নিকটও পাশ্চাত্য জাতির শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং এ বিষয়ে আমরা তাঁহাদের গুরুস্থানীয় হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারি। একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, "ভারতঃ কর্ম্মভূমিস্তু অন্যে তু ভোগভূময়ঃ" এবং আমরা ভারতীয় আর্য্যবংশ সম্ভূত। সংসারে বাস করিয়া নির্লিপ্ত ও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম সাধন করাই শ্রীভগবানের আদেশ। কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে মাত্র, কিন্তু কর্ম্মফল দাতা

ভগবান্। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" কর্ম্মত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নহে ; কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। বনে গেলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাস বনে নহে কিন্তু মনে। একথা প্রকৃতই বলা হইয়াছে ঃ—

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
নিবৃত্তরাগস্য গৃহন্তপোবনম্।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ॥

ত্যাগের ও সংযমের পবিত্র আবরণে ভোগকে আবৃত করতঃ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই প্রকৃত মনুষ্যোচিত। ইহা না করিতে পারিলেই ভোগবাসনা আমাদিগকে বিপথগামী করতঃ পশুত্বের দিকে অগ্রসর করিবেই। প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ পথে চলিবার চেষ্টাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে আমরা ভোগ বাসনার প্রবল স্রোতের মুখে তৃণ খণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইব, তাহা কে বলিতে পারে! অবশেষে আমাদের অস্তিত্বের শেষ চিহ্নটুকুও ভূপৃষ্ঠে হিন্দু নামের পরিচয় দেওয়ার জন্য বিদ্যমান থাকিবে না। প্রবন্ধের বিস্তৃতি আশঙ্কায় সকল কথা বিশদরূপে বলিবার সুবিধা হইল না। অতএব সংক্ষেপে আমাদের বর্ত্তমান সময়ে কোন্ পন্থা অবলম্বনীয় তাহাই ইঙ্গিতে মাত্র ব্যক্ত করতঃ পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

দ্বিতীয় বর্ষ—১ম সংখ্যা সৌরভ হইতে
১৩২০ সন

চিতা ও চিন্তা।

আজ আমি কোনও সুদীর্ঘ অথবা সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ এই সভায় উপস্থিত হই নাই, কেবলমাত্র ২।৪টা মনের কথা শুনাইতে আসিয়াছি; ইহাতে আমি "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং"—ইহা জানিয়াও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে সাহসী হইয়াছি; আপনারা প্রবন্ধের দোষ ভাগ বর্জ্জন করতঃ গুণমাত্রগ্রহণ করিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। "গৃহ্ণাতি সাধুর-পরস্য গুণান্ন দোষান্" এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে, "চিতা চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি জীবিনম্।" অর্থাৎ চিতা ও চিন্তা এতদুভয়ের মধ্যে চিন্তাই গুরুতর, কেননা চিতা নির্জীব মানবদেহকেই দগ্ধীভূত করে মাত্র, কিন্তু চিন্তা সজীব দেহকেই প্রতিনিয়ত ভস্মীভূত করে; একথা অতি প্রকৃত। মৃত মানবদেহ চিতানলে ভস্মে পরিণত হইলে সব ফুরাইয়া যায়, শ্মশানের পরপারে সমস্তই কুহেলিকাময়, তবে তত্ত্বজ্ঞানী জানেন যে, মৃত্যুই জীবনের শেষ নহে, ইহা কোন একটা অবস্থান্তর মাত্র, অথবা "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।" কিন্তু যাহারা দুশ্চিন্তার জ্বালাময়ী বহ্নিশিখার অরুন্তুদ যাতনায় প্রতি পলে পলে জীবন্তই দগ্ধীভূত হইতেছে, তাহাদের অবস্থা কি শোচনীয়! এই আধিব্যাধি-প্রপীড়িত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখে নিয়তক্লিষ্ট সংসারে দুশ্চিন্তায় দগ্ধীভূত না হইতেছেন কে? অম্বরচুম্বী সুরম্য হর্ম্যতলে দুগ্ধফেণনিভ শয্যাশায়ী লক্ষপতি হইতে আরম্ভ করিয়া দিনান্তে শাকান্নভোজী, পর্ণকুটিরবাসী ভিক্ষোপজীবী মানব পর্য্যন্ত কেহই দুশ্চিন্তাশূন্য নহে, অতএব 'চিন্তা দহতি জীবিনং' একথা প্রকৃত বটে। এখন এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, এ বহ্নি নির্ব্বাপনের কি কোন উপায় নাই? দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মানুষের আকৃতি কি বিকৃত, দেখিলেই যেন অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, পক্ষান্তরে সুচিন্তাশীল মানবের মুখাকৃতিতে কি অপূর্ব্ব দেবভাব লক্ষিত হয়, তাহার অধর প্রান্তে কি মধুর হাসি খেলিয়া বেড়ায়! দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মানুষ প্রতিনিয়তই চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নিস্তারের উপায় কি?

মানব-সংসারে চিন্তা দুইভাগে বিভক্ত সু এবং কু। সুচিন্তায় মানুষ দেবতা হয়, আবার কুচিন্তায় সে পশুরও অধম হয়; ইহা প্রতিনিয়তই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, জগতে যাঁহারা সুচিন্তাশীল বলিয়া প্রখ্যাত, তাঁহাদের চিন্তারাশি গ্রন্থস্থ হইয়া এই মানব-সংসারকে স্বর্গতুল্য করিয়াছে, অপরদিকে কুচিন্তামগ্ন মানুষের চিন্তার ফলে এই সংসারে কত বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাতে কত হলাহলময় ফল ফলিয়াছে! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের চিন্তার ফলে পৃথিবীতে যেমন নন্দনকানন সৃষ্টি

হইয়াছে, তেমনি কুচ, টাইমুর, জেঙ্গিস, সুলতান্ মামুদ, মহম্মদঘোরী, দুর্য্যোধন, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানবগণের চিন্তার বিষময় ফলে পৃথিবীতে ভীষণ নরক সৃজন হইয়াছে। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, মিলটন, সেকস্পীয়ার, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, সাদি, হাফেজ প্রভৃতি সরস্বতীর বরপুত্রগণের সুচিন্তালহরী যুগযুগান্তর পরে আমাদের কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। জগতের কত অসংখ্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি মনীষীগণের চিন্তারাশি পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ প্রদান করিয়াছে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে?

মূলকথা সু ও কুচিন্তার সংঘর্ষেই এই সংসারে সুচিন্তার বারিরাশি বর্ষিত না হইলে, এ সংসার এতদিনে ভস্মরাশিতে পরিণত হইত। বর্ত্তমানকালে আমরা যেন কুচিন্তায় একেবারে দগ্ধীভূত হইতেছি। অন্ন-চিন্তা ও অর্থ-চিন্তাতেই আমাদের মন প্রাণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ইহাতে যুক্তির শীতলবারি প্রক্ষেপের উপায় নির্দ্ধারিত না হইলে আর যেন নিস্তার নাই। ভারতবর্ষ এখন চিতা ও চিন্তানলে পুড়িয়া ছাই হইবার মত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষজনিত অনশনে এবং মহামারিতে ভারতের চতুর্দ্দিকে এখন চিতাবহ্নি অহর্নিশিই জ্বলিতেছে, এদৃশ্য অতি হৃদয়বিদারক। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই অকর্ম্মণ্য ও ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য হইতেছে। চতুর্দ্দিকে যেন একটা ভীষণ বহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে এবং আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাতে দগ্ধীভূত হইতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চিন্তার আগুন নিভাইবার উপায় কি, এ প্রশ্ন মনকে বিভ্রান্ত করিতেছে। আমার মনে হয়, আমাদের এই

দুঃসময়ে কতকটা সংযম সুশিক্ষার পথ প্রশস্ত করা উচিত। আর্য্য মহর্ষিগণ সংযম ও সুশিক্ষার কত উচ্চ-মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা কল্পনারও অতীত, ফলতঃ পৃথিবীর নানা প্রলোভন ও বিলাস বিভ্রম হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারা যেমন উচ্চ ও সুচিন্তায় মগ্ন ছিলেন, পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিই তদ্রূপ করিতে সমর্থ হন নাই। সত্য বটে বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া আমরা অনেক পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে দুঃখদৈন্য ও দুশ্চিন্তা দূরে অপসারিত হইয়াছে কি? আমরা কি শান্তির সুশীতল ছায়া উপভোগ করিতে পারিতেছি? দুশ্চিন্তার বিষম দহনে আমাদের চিত্ত কি জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে না? অত্রাবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমার মনে হয় ভারতীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিতে পারিলেই, মানুষ অনেকটা সুখী হইতে পারে এবং চিন্তানলও কতকটা উপশম্ত হইতে পারে। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ যেন দিব্য জ্ঞানোজ্জ্বল সুন্দর সুরলোক হইতে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন এবং জলদগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, মাভৈঃ! আমাদের সংগৃহীত সুশীতল বারির গণ্ডূষমাত্র গ্রহণ করতঃ তোমাদের চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে প্রক্ষেপ কর, তাহাতেই সব জ্বালা জুড়াইবে।

এই অভয়বাণী কি আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছে? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে আর ভীতিবিহ্বল চিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হইতে হইবে না। চলুন আমরা বৃদ্ধ ঋষিগণের শরণাগত হই এবং তৎসহ পাশ্চাত্য সুধীগণের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি

আহরণে প্রবৃত্ত হই, নতুবা বর্ত্তমান শঙ্কটে আর উপায় নাই, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্নরাজি নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা হেলায় নষ্ট করিতেছি এবং হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলিয়া আজ আমরা পরমুখাপেক্ষী ও পথের ভিখারী হইয়াছি, দুশ্চিন্তা-বহ্নিতে নিয়ত জর্জ্জরিত হইতেছি, অপর দিকে সেই রত্নরাশির অল্পাংশ মাত্র কুড়াইয়া লইয়া পৃথিবীর অপরাপর জাতি আজ মহাধনী হইতেছেন এবং আমরা কেবলই হা হতোস্মি করিতেছি। আমাদের এখন দুঃসময়, কাজেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট, ইহাই হওয়া স্বাভাবিক, কেননা "প্রায়ঃ সমাপন্ন বিপত্তিকালে ধিয়োপি পুংসাং মলিনীভবন্তি।" সময় থাকিতে সাবধান না হইলে আমরা বিলয় দশা প্রাপ্ত হইবই।

ভারতবর্ষে যে চিতা ও চিন্তাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহা আর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে না। অবশেষে এই ভারতভূমি কেবল চিতাভস্মে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। তাই বলি সুধিগণ সত্বর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করতঃ আমাদের রক্ষার উপায় করুন। আমার মনে হয় ভারতবাসীর পক্ষে এই সমন্বয় সাধন যতটা সম্ভবপর অন্য কোনও জাতির পক্ষে ততটা নহে। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা আজ এই সমন্বয় সাধনের শতবিধ সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি, সুযোগ হারাইলে হা হুতাশই সার হইবে। ভারতবাসী বলিয়াই আমার অন্যতম অধ্যাপক স্বনাম-ধন্য বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আজ তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানালোকিত পাশ্চাত্য জগৎকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিতে পারিয়াছেন। তিনি হয়ত নূতন কিছুই করেন নাই, কেবল মাত্র বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই পুণ্য ভারতক্ষেত্রে

ধ্বনিত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বৈদিক মহাবাণীরই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন মাত্র ; তাহারই মেঘমন্দ্র প্রতিধ্বনি আজি পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে শ্রুত হইতেছে এবং প্রাচীন ভারতের ঋষিচরণে জগৎ বিস্ময়ে প্রণত হইতেছে। ইহা দেখিয়াই আমার মনে হয় হিন্দু অধঃপতিত হইলেও তাহা দ্বারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধিত হইবে। সেই শুভ মুহূর্ত্ত যেন আগত প্রায়, একটা যেন কি সুবাতাস বহিতেছে, কি যেন একটা সুখের স্বপ্ন দেখিতেছি। ভগবান কি এই অধঃপতিত জাতির প্রতি কৃপানেত্রে ফিরিয়া চাহিবেন? আমরা কি আবার মানুষ হইব, ঋষির গৌরব কি রক্ষা করিতে পারিব? আমার মনে হয় আমাদের অন্নচিন্তা ও অন্নচিন্তার জ্বালা কতকটা উপশম প্রাপ্ত হইলে যেন আমরা আবার জগতের সমক্ষে আর্য্যনামের গৌরব রক্ষা করিতে পারিব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সুগভীর সত্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করতঃ প্রাচ্য জ্ঞানের আলোক তাহা প্রোজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিলেই আমাদের অনেক সুখশান্তির পথ পরিষ্কৃত হইবে। তৎসহ অন্নচিন্তারও একটা মীমাংসা হইবে। অতএব চলুন আমরা প্রাচীন ঋষিগণের শরণাগত হই এবং পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার সহিত যুগপৎ ভারতীয় আধ্যাত্মিকজ্ঞানপূর্ণ দর্শন, পুরাণ প্রভৃতির এবং আয়ুর্ব্বেদাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ পরিহার পূর্ব্বক প্রকৃত উন্নতির চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হই, নতুবা আমরা কেবল চিতা ও চিন্তাবহ্নিতেই পুড়িতে থাকিব, এই বহ্নিদ্বয়ের লোলহান শিখা আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। পৃথিবীর বক্ষ হইতে হিন্দুজাতি বিলুপ্ত হইবে। শ্রোতৃবৃন্দ হয়ত মনে করিতেছেন, আমি কতকগুলি

অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতেছি ;—না, ইহা প্রলাপ নহে, তবে আমার প্রবন্ধ যে সুশ্রাব্য ও সুযুক্তিপূর্ণ হইয়াছে তাহা একেবারেই বলিতে পারি না ; এই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি কোনও সুলিখিত প্রবন্ধ শুনাইতে আসি নাই, কেবল দুই একটী আবেগপূর্ণ মনের কথা বলিতে আসিয়াছি ; ইহাতে আমার কোনও ত্রুটি হইয়া থাকিলে সভ্যগণ মার্জ্জনা করিবেন।

উপসংহারে নিবেদন, সাহিত্য-সভা যেন বঙ্গদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন, তাহা হইলেই আমরা বলিতে পারি যে, সিংহের ঔরসে আমরা শৃগাল নহি। চলুন সকলে মিলিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানের স্বচ্ছ কাচাবরণে ঋষির দিব্য জ্ঞানোজ্জ্বল দীপ-বর্ত্তিকা স্থাপন করত: জগৎকে পথ প্রদর্শন করি, তবেই হিন্দুনাম গৌরবান্বিত হইবে এবং চিতা ও চিন্তাবহ্নির জ্বালাও অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইবে। বিস্তারেণালম্।

ভারতীয় কবি ও চিত্রকর।

কবি ও চিত্রকর উভয়ই এক শ্রেণীভুক্ত। প্রথমোক্ত মহাত্মা তাঁহার মনোভাব সুললিত ও চিত্তাকর্ষক ভাষার সাহায্যে লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিয়া থাকেন; এবং অপরে (চিত্রকর) তাহা সুরঞ্জিত ও নয়নমোহকর বর্ণসংযোগে তুলিকাদ্বারা চিত্র-ফলকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়া দেন। কেবল মাত্র ছন্দোময়ী ভাষাই যেমন উৎকৃষ্ট কাব্যের পরিচায়ক নহে, তদ্রূপ কেবল মাত্র বিচিত্র বর্ণবিন্যাসই উৎকৃষ্ট চিত্রের লক্ষণ নহে। বস্তুতঃ, ভাবমূলক ছন্দ অথবা গদ্যময়ী ভাষা, উভয়ত্রই প্রকৃত কবিত্ব সম্ভবপর; এবং তন্মূলক আলোক ও ছায়াযুক্ত (Light and Shade) বর্ণবিন্যাসই সুনিপুণ চিত্র। কি কাব্যে, কি চিত্রে, ভাবপরিস্ফুট না হইলে, কবি অথবা চিত্রকরের শ্রম নিরর্থক হয়। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"—রসাত্মক বাক্য-বিন্যাসই কাব্য,—কবি শৃঙ্গারাদি রসের অবতারণা করিতে যাইয়া, তাহা সুব্যক্ত করিতে না পারিলে, তাঁহার শ্রম কেবল পণ্ডশ্রম হয়। চিত্রকরের পক্ষেও এই উক্তি প্রযোজ্য।

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে পীযূষোপম অগণ্য কাব্যমালা বিদ্যমান। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের নিকট ইহার কতকগুলি কেবল মাত্র ছন্দোবদ্ধ কবিতামাত্র, অতএব সেগুলি উৎকৃষ্ট কাব্যনামে অভিহিত হইতে

পারে না, কিন্তু আবার কতকগুলি জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে অতুলনীয়। যে দেশে মহাকবি বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস-প্রমুখ মহামনস্বী কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের প্রচারিত কাব্য নাটক প্রভৃতিতে সুনিপুণ চিত্রাদির ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে দেশে উৎকৃষ্ট চিত্রাদির অভাব দেখিলে, বিস্মিত ও পরিতপ্ত হইতে হয়, এবং সত্যই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, "প্রাচীন ভারতে কি একজনও ভেণ্ডাইক্ অথবা র‍্যাফেলের ন্যায় চিত্রকর উদ্ভূত হয়েন নাই?" একথা বিশ্বাস করিতে যে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের অনুমান হয়, এক সময়ে এই অধঃপতিত ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাকবি ভবভূতি প্রণীত সুবিখ্যাত উত্তরচরিত নাটকের চিত্রদর্শন নামক অভিনয় উল্লেখ করা যায়, এবং মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ কাব্য হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যথা—"আলেখ্যশেষং পিতরং দদর্শ।"

এতদ্ব্যতীত উক্ত মহাকবি প্রণীত কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রভৃতি হইতে অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়। রত্নাবলী নাটিকা, মালতীমাধব নাটক প্রভৃতিতেও চিত্রবিদ্যার অস্তিত্ব ভূরি ভূরি প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য নহে, বাহুল্য ভয়ে সকলগুলি উদ্ধৃত হইল না, কৌতূহলী পাঠকবর্গ মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করিলেই এ বিষয় নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। এস্থলে কুমারসম্ভব হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে, যথা—

"উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং
সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।"
"তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং
চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে।"

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতেও এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কালবশে এবং শত সহস্র বিপ্লবে ভারতের অনেক কীর্ত্তিকলাপই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা জাতীয় অধঃপতনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, সুসভ্য ও কলানিপুণ ইংরেজ জাতির সংস্রবে ভারতবর্ষে অধুনা চিত্রবিদ্যার পুনরভ্যুদয় হইতেছে। আশা হয়, অচিরেই উক্ত বিদ্যা ফলবতী হইবে। বর্ত্তমান কালে স্বনামখ্যাত রাজা রবিবর্ম্মা প্রমুখ কতিপয় প্রতিভাশালী চিত্রকর স্বীয় স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া আমাদের আশাতরুর মূলে বারিসিঞ্চন করিতেছেন। ভগবানের কৃপায়, তাহা মুকুলিত হইয়া ফলবতী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবিবর্ম্মার চিত্রগুলি ভাবময় এবং সুরুচিসম্পন্ন এবং এগুলির বর্ণবিন্যাস সুনিপুণ ও মনোহর। আশা হয়, ইঁহার ন্যায় আরও প্রতিভাশালী চিত্রকর আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। রবিবর্ম্মাকৃত চিত্রগুলি প্রায়ই এক ছাঁচে ঢালা, এবং রমণীমূর্ত্তিগুলি যেন প্রাদেশিক ভাবে চিত্রিত, অর্থাৎ প্রায়ই 'বোম্বেয়ে' রকমের; এবং চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তিগুলির বেশভূষা ঠিক সময়োচিত নহে, সেগুলি যেন একটু Anachronism দোষযুক্ত। তথাপি বলিতে হইবে যে, রবিবর্ম্মাকৃত চিত্রাবলি আমাদের স্পর্দ্ধার সামগ্রী। ভারতের রাজপ্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর ভারতবর্ষীয় উৎসন্নপ্রায়

শিল্পবিদ্যার পুনরুদ্ধার-কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন; এবং জাতীয় মহাসমিতি বার্ষিক অধিবেশনের সহিত শিল্প-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া, প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্যের পথ প্রসর করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন দেশীয় কৃতবিদ্যমণ্ডলী এবং ধনীসম্প্রদায় পৃষ্ঠপোষক হইলে শিল্পী ও চিত্রকরগণ দ্বিগুণ উৎসাহে স্বীয় স্বীয় বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিতে পারে। নতুবা সমস্ত চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য হইবে। আমাদের ধনীসম্প্রদায় বৈদেশিক শিল্পের প্রতি যাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার শতাংশের একাংশও দেশীয় শিল্পকার্য্যের প্রতি প্রদর্শিত হইলে, দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত এবং রবিবর্ম্মার ন্যায় আরও সুনিপুণ চিত্রকর প্রাদুর্ভূত হইতেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের সে আশা সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষে এক সময়ে চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা প্রচারিত হইয়াছিল। অধুনা তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত, ইহা আমাদের অবনতিরই পরিচায়ক। চেষ্টা করিলে, ইহার অনেকগুলির পুনরভ্যুদয় হইতে পারে, অতএব সময়োচিত প্রযত্ন বিধেয়।

আলোচ্য বিষয় হইতে আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; অতএব প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক—কবি কল্পনার চক্ষে কত বিচিত্র বস্তুই দর্শন করেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার মানসিক গতির সীমা নাই। তিনি কখনও পৃথিবীতে কখনও অনন্ত তারকা-গ্রহখচিত নভোমণ্ডলে, কখনও স্বর্গে, কখনও নরকের গভীর অন্ধকারে, আবার কখনও তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বত-শিখরে, কখনও বা অতল

জলধি-গর্ভে কল্পনা বলে বিচরণ করেন। ফলতঃ মহাকবি সেক্‌স-পীয়র যথার্থই বলিয়াছেন,—

—"The poet's eye in fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven ;
And, as imagination bodes forth,
The forms of things unknown the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

মহাকবি কালিদাস একখানা সামান্য মেঘ, একজন নীরিহ যক্ষ এবং তদীয় বিরহ-বিধুরা একবেণীধরা মলিনা ও কৃশা পত্নীকে আহ্বান করিয়া কল্পনার কতই না বিচিত্র লীলা খেলা দেখাইয়াছেন,—ক্রমেই লীলা তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী-মুখে গভীর জীমূত-মন্দ্রে মন্দাক্রান্তা ছন্দে উচ্ছলিত হইয়া আমাদের কর্ণে আজও সুধাবর্ষণ করিতেছে এবং আরও কতকাল এই ভাবেই চলিয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? ধন্য কবি কালিদাস এবং ভারতবর্ষ—যে দেশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে ! একজন সুনিপুণ চিত্রকর যদি এই মেঘদূতের বর্ণিত বিষয়টি চিত্রফলকে ভাব সমাবেশ সহকারে প্রতিফলিত করতঃ আমাদের নয়নগোচর করিতে পারেন, তবে কতই না আনন্দের বিষয় হয়। ফলতঃ আমাদের পুরাণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতিতে সুললিত চিত্রের অনেক আদর্শ বর্ত্তমান আছে, আমাদের বিবেচনায় সেইগুলি অবলম্বনেই চিত্রাঙ্কিত করা সঙ্গত, তাহাতে ভাববিকাশও সহজ হয় এবং আমাদেরও উহা অধিকতর মনঃপূত হয়। বৈদেশিক

ভাব ধারণা করা দুরূহ; তাহা চিত্রে প্রতিফলিত করাও আয়াস-সাধ্য। অতএব দেশীয় আদর্শ অবলম্বন করাই সমীচীন। রবিবর্ম্মা এই পন্থা অবলম্বন করিয়া দূরদর্শিতা এবং ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন, এই জন্য তিনি ধন্যবানার্হ। শুনিতে পাই, কোনও উদীয়মান বঙ্গীয় চিত্রকরও এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার চিত্রাবলী আমরা আজও দেখিবার অবসর পাই নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে বিরত রহিলাম।

আমাদের বিবেচনায় হিন্দুরমণীগণের পক্ষে চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা অবাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যুত রমণীর ভাবপ্রবণ কোমল হৃদয়ে সুললিত কলা বিদ্যার বীজ উপ্ত হইলে, তাহা সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া মহা-মহীরুহে পরিণত এবং কালে ফলবান্ হইবে, ইহা বোধ হয় অসম্ভব নহে। কথা এই যে, এবিষয়ে তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে কে? রমণীগণের পুরুষদ্বারা শিক্ষিত হওয়া, আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত নহে, অথচ এবিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীরও অভাব। এ সমস্যার মীমাংসা কি? সুধীগণের ইহা বিবেচ্য বটে। মধ্যম শ্রেণীর ভদ্র পরিবারের মহিলাগণ নানাবিধ গৃহকার্য্যে লিপ্ত রহিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ধনীগৃহের রমণীগণ বিলাসের ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া অথবা বাক্যালাপে পরনিন্দার আমোদ উপভোগ করিয়া—দর্পণে স্বীয় স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া—কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেল পড়িয়া এবং সুবাসিত তাম্বুল-চর্ব্বণে অধর রঞ্জিয়া সময়ের অপব্যবহার করিয়া থাকেন। অবশেষে রুগ্নদেহে, ভগ্নমনে, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় কালসাগরে বিলীন হইয়া যান। এই অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে কলা বিদ্যার আলোচনা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন ভারতে রাজকুলবধূরা, রাজকন্যাগণ এবং অন্যবিধ নাগরিক মহিলাগণ সুকুমার কলা বিদ্যা আলোচনায় সময়পাত করিতেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতএব আধুনিক হিন্দু রমণীগণের পক্ষে তাঁহাদের পদানুসরণ করা শ্রেয়ঃ।

বর্ত্তমানকালে, আমাদের দেশে অনেক মহাত্মা পাশ্চাত্য মতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার অনুশীলন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হওয়ার কারণ নাই : যেহেতু,—'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশঃ জনঃ'। প্রকৃতপক্ষে আলোক ও ছায়াপাত চিত্রে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে, চিত্র কেবল পট মাত্র হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ চিত্রই এই শ্রেণীর। অতএব এবিষয় শিক্ষা সাপেক্ষ।

কোন কোন বঙ্গীয় যুবক ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহাদের লব্ধ-বিদ্যা প্রচারের রীতিমত চেষ্টা হওয়া আবশ্যক এবং দেশীয় আদর্শ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্রাঙ্কনে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষে অচিরেই চিত্রবিদ্যা পুনরুজ্জীবিত হইবে; এবং প্রত্যেক বিপণিতে এবং ধনী ও অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলীর গৃহে আমরা সুরঞ্জিত বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ, সুঠাম চিত্রাবলী বিলম্বিত দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে পারিব এবং দেশীয় সুধিবৃন্দ ও ধনী সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে শিল্পিগণকে উৎসাহ দান করিবেন।

ভগবানের কৃপায় অচিরেই আমাদের এই অতৃপ্ত বাসনা ফলবতী হইবে; এবং স্বদেশের যশোভাতি দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইবে। এখন অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; অতএব সময়োচিত তরণী

বাহিয়া চলা উচিত। স্বদেশীয় কর্ণধারগণকে এ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই ভারতবর্ষ প্রকৃতির লীলাভূমি,—এবং ইহার কাব্য-কাননে সুন্দর প্রসূনরাজি বিরাজিত। ইচ্ছা করিলেই ই?া হইতে চিত্রের যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। অতএব কি Landscape (প্রাকৃতিক) painting কি protrait painting (মানবচিত্রে) অনেক আদর্শ এই ভারতবর্ষ হইতেই সংগ্রহ করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তবেই সেগুলি আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হইবে এবং বৈদেশিক চিত্র অপেক্ষা সমধিক নয়নানন্দকর ও হৃদয়গ্রাহী হইবে।—অলমতি বিস্তারেণ।

প্রাচীন ভারতের চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। কলাবিদ্যাকে Fine arts বলিয়া অনুবাদ করিলে অর্থের সঙ্কোচ করা হয়; কারণ Fine arts বলিতে আমরা কবিতা, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যাই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু কলাবিদ্যা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই এ বিষয় বিশদ হইবে।

মানবের যতগুলি বৃত্তি (Faculty) আছে, তন্মধ্যে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি (Aesthetic Faculty) অন্যতম। অন্যান্য বৃত্তির পরিতৃপ্তি সহ এই বৃত্তির চরিতার্থতার উপরই মানবের সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব-বিকাশ নির্ভর করে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সভ্যতার উচ্চ সোপানারূঢ় অথবা নিবিড় অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অসভ্য মানব—সকলেই কোনও না কোনও প্রকার চিত্তবিনোদনের উপায় উদ্ভাবন জন্য নিয়তই ব্যগ্র; কেননা, এতদ্ব্যতীত ত্রিতাপদগ্ধ মানব কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না। তবে যে সমস্ত মহাপুরুষ পরমা শক্তির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, আনন্দময় হইয়া যান, তাঁহাদের পক্ষে পার্থিব সমস্ত আনন্দই অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ।

যে জাতির সভ্যতা যত উচ্চ সোপানে স্থিত, সেই জাতির কলা বিদ্যা ততই বহুশাখায় বিভক্ত, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে প্রাচীন

ভারতের চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার আলোচনা করিলে হিন্দুজাতি সভ্যতার কত উচ্চ স্তরে অবস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। কলা শব্দ অংশ অর্থেই ব্যবহৃত হয়, অতএব চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা দ্বারা আমরা বিদ্যার চতুঃষষ্টিপ্রকার অংশবিভাগই গ্রহণ করিতে পারি ; অথবা art অর্থে গ্রহণ করিলেও ক্ষতি নাই।

কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াস করিলেই সর্ব্বাদৌ আমাদিগকে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার ও সর্ব্ববিধ বিদ্যার আকর, পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। "বেদ অপৌরুষেয় এবং অনাদি," ইহা আস্তিক হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চতুর্ব্বেদ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ, বেদের এই ষড়ঙ্গ ; পুরাণ (মহা ও উপ পুরাণ), ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র, এই চারিটী বেদের উপাঙ্গ। বৈশেষিক দর্শন ন্যায়ের অন্তর্গত। বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা) মীমাংসা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। মহাভারত, রামায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত দর্শন ও বৈষ্ণবশাস্ত্র—ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীতশাস্ত্র) ও অর্থশাস্ত্র, এই চারিটী উপবেদ সহ বিদ্যা অষ্টাদশ প্রকার এবং এই সমস্ত বিদ্যাই প্রাচীনকালে আস্তিক মতাবলম্বী মানবগণের উপজীব্য ও আলোচ্য ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

"পুরাণন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥"

এতা এব চতুর্ভিরুপবেদৈঃ সহিতা অষ্টাদশ বিদ্যা ভবন্তি। আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্ববেদোঽর্থশাস্ত্রঞ্চেতি চত্বার উপবেদাঃ।

সর্ব্বেষাং চাস্তিকানামেতাবন্ত্যেবে শাস্ত্রপ্রস্থানানি। অন্যেষামপ্যেক-দেশিনামেতেষ্বেবান্তর্ভাবাৎ।"

এতদ্ব্যতীত নাস্তিক মতাবলম্বীগণেরও উপজীব্য ও আলোচ্য বিবিধ প্রকার বিদ্যা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে হইলে, শ্রীমদ্ মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত বিখ্যাত ও অতি সমীচীন "প্রস্থানভেদ" গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ উপবেদের মধ্যে অর্থশাস্ত্রের বহুশাখা বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, হস্তিশাস্ত্র, বৃক্ষশাস্ত্র প্রভৃতি, শিল্পশাস্ত্র, সূপকারশাস্ত্র (পাকশাস্ত্র)ও চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা অর্থশাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত শাস্ত্রের বিবিধ গ্রন্থ নানা মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া, প্রাচীন ভারতে উন্নতির পরাকাষ্ঠা সাধিত করিয়াছিল। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, উল্লিখিত শাস্ত্রাদির প্রয়োজন লৌকিক; পরন্তু বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন পারলৌকিক। ধনুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মাচরণ (যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্য সাধন), দুষ্টের দমন এবং দস্যু প্রভৃতির আক্রমণ হইতে প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষণ। ব্রহ্ম-প্রজাপতি ক্রমে বিশ্বামিত্র ঋষি কর্ত্তৃক এই ধনুর্ব্বেদ জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত শাস্ত্র) ভরতমুনি কর্ত্তৃক সর্ব্বাদৌ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দেবতারাধনা এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি-সিদ্ধি লাভই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল।

একথা যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে:—

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

পাঠকবৃন্দ, বোধ হয়, এতদ্দ্বারা প্রণিধান করিতে পারিতেছেন যে, প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত বিদ্যার উদ্দেশ্য কত উচ্চ ও মহান ছিল, পক্ষান্তরে বর্ত্তমানে সেই বিদ্যাকে আমরা কতদূর নিম্ন সোপানে আনয়ন করিয়াছি এবং সঙ্গীতকে কেবলমাত্র বিলাসিতার সহায় করিয়া প্রকৃত সঙ্গীতের গৌরব নষ্ট করিয়াছি। সঙ্গীতশাস্ত্র নৃত্য গীত ও বাদ্যভেদে ত্রিবিধ। এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় তাহা পরিত্যক্ত হইল। আয়ুর্ব্বেদও অষ্টাঙ্গে বিভক্ত হইয়া নানা মুনি কর্ত্তৃক বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্বায়ুর্ব্বেদ ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা প্রকৃত প্রস্তাব হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি,—এখন আলোচ্য বিষয়েরই অবতারণা করা যাইতেছে। বাৎস্যায়ন মুনি প্রণীত বিখ্যাত কামসূত্র গ্রন্থের সাধারণাধিকরণের তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে :—

"ধর্ম্মার্থাঙ্গবিদ্যাকালাননুপরোধয়ন্ কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চ পুরুষোঽধীয়ীত" এই সূত্রের টীকাকার যশোধর জয়মঙ্গলাখ্য টীকায় বলিতেছেন যে,—

"তত্র ধর্ম্মবিদ্যা—শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ। অর্থবিদ্যা—বার্ত্তাশাস্ত্রম্। তয়োরঙ্গবিদ্যা—দণ্ডনীতিঃ, যোগক্ষেমসাধনাৎ, আন্বীক্ষিকী তু তত্ত্ব-নিশ্চয়হেতুত্বাৎ। তাসাং প্রধানানাং যথাস্বমধ্যয়নকালানুপ-রোধয়ন্নহাপয়ন্, অন্তরান্তরা কামসূত্রমিদমেব তদঙ্গবিদ্যাশ্চ গীতিদিকা অধীয়ীত—পাঠশ্রবণাভ্যাম্ ইতি।"

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কলাবিদ্যা (গীতবাদ্য প্রভৃতি) কামশাস্ত্রেরই অন্তর্গত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা

অর্থশাস্ত্রেরই অঙ্গ। এই দুইটী মতই সমীচীন। কারণ, একভাবে দেখিলে কলাবিদ্যা কামশাস্ত্রেরই অঙ্গবিশেষ—অন্যভাবে বিচার করিলে এগুলি অর্থশাস্ত্রেরও অন্তর্ভুক্ত বটে। বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, স্ত্রী জাতিরও এই শাস্ত্র পাঠে অধিকার ছিল। কামসূত্রের সাধারণাধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় সূত্রই ইহার প্রমাণ, যথা—"প্রাগযৌবনাৎ স্ত্রী। প্রত্তাচ পত্যুরভিপ্রায়াৎ।" স্ত্রী যৌবনের পূর্ব্বে (অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে) কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারেন, কিন্তু বিবাহিতা হইলে স্বামির অভিপ্রায়ানুসারে পাঠ করিবেন, অন্যথায় নহে।

চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা কামশাস্ত্রের অন্তর্গত হওয়ায়, তাহাতে স্ত্রীজাতিরও অধিকার ছিল, তাহা সপ্রমাণ হইল। সম্প্রতি কামশাস্ত্রে বর্ণিত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার প্রত্যেকটীর নাম উল্লেখ করতঃ যশোধরকৃত জয়মঙ্গলাখ্য টীকানুসারে সেগুলি বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় যশোধরকৃত টীকার যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ না হইলেও তদবলম্বনেই কোনও কোনও স্থলে বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিব।

(১) গীত, (২) বাদ্য, (৩) নৃত্য,—এগুলির প্রত্যেক বিষয় শিক্ষোপযোগী বহুগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল (সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীতদামোদর, তালবিরোধ, নর্ত্তক-নির্ণয় প্রভৃতি)।

(৪) আলেখ্যম্—এ সম্বন্ধে জয়মঙ্গলা টীকায় যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল :—

আলেখ্যমিতি—রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবো লাবণ্যযোজনম্। সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গমিতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥ এতানি পরানুরাগজন-

কাম্যাত্মবিনোদনার্থানি চ। রূপে বৈশিষ্ট্য (যাহার যে স্থানে যেরূপ হওয়া সঙ্গত, সেই রূপ যথাযথ প্রদর্শন), প্রমাণ, ভাব ও লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ (নানা প্রকার বর্ণদ্বারা তুলিকাযোগে চিত্রের উৎকর্ষ সাধন জন্য শ্রেণীবদ্ধ রূপে বর্ণবিন্যাস), এই ছয় প্রকার চিত্রযোগ। আলেখ্য চিত্রণের এই বর্ণনা পাঠে কি প্রতিপন্ন হয় না যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল? সংস্কৃত নাটক ও কাব্য প্রভৃতিতে চিত্রবিদ্যার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয় সংস্কৃত সাহিত্যবিৎ মাত্রেই অবগত আছেন।

(৫) বিশেষকচ্ছেদ্যম্—বিশেষকোস্তিলকো যো ললাটে দীয়তে, তস্য ভূর্জাদিপত্রময়স্যানেকপ্রকারং ছেদনঞ্চচ্ছেদ্যম্। পত্রচ্ছেদ্যমিতি বক্তব্যম্। রক্ষতি চ পত্রচ্ছেদ্যানি নানাভিপ্রায়াকৃতীনি প্রেষয়েৎ ইতি সত্যম্। বিশেষকগ্রহণমাদরার্থং বিলাসিনীনামতি প্রিয়ত্বাৎ। বিশেষকচ্ছেদ্য বোধ হয় অলকা তিলকা প্রভৃতি দেওয়ার কার্য্য।

(৬) তণ্ডুলকুসুমবলিবিকারাঃ—অখণ্ডতণ্ডুলৈর্নানাবর্ণৈঃ সরস্বতীভবনে কামদেবভবনে বা মণিকুট্টিকাদিষু ভক্তিবিকারাঃ। তথা কুসুমৈর্নানাবর্ণৈগ্রথিতৈঃ শিবলিঙ্গাদিপূজার্থং ভক্তিবিকারাঃ। অত্র গ্রথনং মাল্যগ্রথন এবান্তর্ভূতম্। ভক্তিবিশেষাণাং স্থাপনম্। ইহা বোধ হয়, আলেপন দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য এবং মালাগ্রথন কার্য্য।

(৭) পুষ্পাস্তরণম্—যন্নানাবর্ণৈঃ পুষ্পৈঃ সূচীবাণাদিবিদ্ধৈর-বভ্যস্যতে, তদেব বাসগৃহোপস্থানমণ্ডপাদিষু। যস্য পুষ্পশয়নমিত্য-

পত্রসংজ্ঞা (ফুলসজ্জারচনা)। সূচ দ্বারা সেলাই করত নানাবর্ণে পুষ্পের মালা রচনা কার্য্য।

(৮) দশনবসনাঙ্গরাগঃ—দন্তে, বস্ত্রে এবং অঙ্গে (শরীরে) নানাপ্রকার বর্ণযোগ কার্য্য।

(৯) মণিভূমিকাকর্ম্ম—গ্রীষ্মকালে শয়ন, উপবেশন ও পান-ভোজনাদির জন্য চত্বরকে যে মরকতাদি মণিদ্বারা সুশোভিত করা হয়, তাহাকে মণিভূমিকাকর্ম্ম বলে। বিবিধবর্ণের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পুষ্প, ফল ও পত্রাদির অনুকল্প প্রস্তুত করত চত্বরে সন্নিবেশ করা।

(১০) শয়নরচনম্—শয়নকারীর তৎকালিক মনের ভাব বুঝিয়া যে শয্যা রচনা করা হয়, তাহা। শীতগ্রীষ্মাদি-ভেদে ও আহারের তারতম্যানুসারে রক্ত, বিরক্ত ও মধ্যস্থ এই তিন প্রকার শয্যারচনা কর্ম্ম। (এগুলির ঠিক অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারি নাই)।

(১১) উদকবাদ্যম্—জলতরঙ্গাদি বাদ্য অথবা জলে মৃদঙ্গাদি বাদ্যের ন্যায় বাদ্য করা।

(১২) উদকঘাতঃ—হস্তযন্ত্রযুক্তৈরুদকৈস্তাড়নম্। তদুভয়ম্ জলক্রীড়াঙ্গম্। হস্ত ও যন্ত্রদ্বারা উৎক্ষিপ্তাবক্ষিপ্ত জল দ্বারা তাড়ন। এই দুইটাই জলক্রীড়ার অঙ্গ।

(১৩) চিত্রযোগ—প্রচলিত ভাষায় ইহাকে 'ঔষধ করা' বলে, ইহার ব্যাখ্যা করা হইল না। এটি কামশাস্ত্রের প্রয়োগবিশেষ।

(১৪) মাল্যগ্রথনবিকল্পাঃ—মুণ্ডমালাদি রচনা। দেবতা পূজার জন্য মাল্যালঙ্কার গ্রথন বিশেষ। বিনাসূত্রে হার গাঁথা।

(১৫) শেখরকাপীড়যোজনম্—গ্রন্থনবিকল্প এবায়ং কিন্তু যোজনম্ কলান্তরম্। তত্র শেখরকস্য শিখাস্থানেঽবলম্বনন্যাসেন

পরিধাপনাৎ, আপীড়স্য চ মণ্ডলাকারেণ গ্রথিতস্য কাছিকাযোগেন পরিধাপানাৎ নানাবর্ণৈঃ পুষ্পৈর্ব্বিরচনং যোজনম্। টুপী পাগড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করন এবং পুষ্প দ্বারা মস্তক ভূষণ প্রস্তুত করণ।

(১৬) নেপথ্যপ্রয়োগঃ—দেশ কাল ও পাত্রভেদে বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণ। (শরীর শোভার্থ)।

(১৭) কর্ণপত্রভঙ্গঃ—শঙ্খ প্রভৃতি দ্বারা কর্ণাভরণ (কাণফুল প্রভৃতি প্রস্তুত করার কার্য্য)।

(১৮) গন্ধযুক্তিঃ—যথাশাস্ত্র নানাবিধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করন।

(১৯) ভূষণযোজনম্—অলঙ্কার প্রস্তুত করণ এবং তাহা প্রয়োগ যশোধর ইহা দ্বিবিধ বলিয়াছেন। তদ্যথা—(১) সংযোজ্য—মণিমুক্তা প্রভৃতি দ্বারা কণ্ঠহার, চন্দ্রহারাদি প্রস্তুত করা (জড়াও কাজ) এবং (২) অসংযোজ্য—অর্থাৎ কেবলমাত্র স্বর্ণ দ্বারা কটক বলয়াদি প্রস্তুত করা।

(২০) ইন্দ্রজাল—ইহা প্রসিদ্ধ (magic)।

(২১) কৌচমারযোগঃ—কুচমার একজন কামশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। ইঁহার উপদেশানুসারে কুরূপকে সুরূপ করিয়া এবং সুরূপকে কুরূপ করিয়া দেখান এবং অনুরক্তকে বিরক্ত ও বিরক্তকে অনুরক্ত করা যায়।

(২২) হস্তলাঘবম্—সর্ব্বকার্য্যে হস্তের লঘুতা এবং বাজি দেখানর সময় হাতের সাফাই।

(২৩) বিবিধশাকযুবভক্ষ্যাধিকারক্রিয়া—নানাপ্রকার শাক ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত ক্রিয়া (সূপশাস্ত্র)।

(২৪) পানকরসরাগাসবযোজনম্—সরবৎ, পেয় প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্য। জয়মঙ্গলা টীকায় এসম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

(২৫) সূচীবানকর্ম্মাণি—সূচী (ছুঁচ) দ্বারা বস্ত্র সন্ধান করা (যোড়ালাগান); ইহা তিন প্রকার—(১) সীবন, (২) উত্ম ও (৩) বিরচন। সীবন (কঞ্চুকাদি, জামা প্রভৃতি সেলাই করা); উত্ম বোধ হয় ত্রুটিত বস্ত্রের সংস্কার, রিফুকর্ম্ম প্রভৃতি; বিরচন অর্থাৎ কাঁথা লেপ প্রভৃতিতে সেলাই করিয়া ফুলকাটা প্রভৃতি।

(২৬) সূত্রক্রীড়া—ইহা একপ্রকার বাজি বা খেলামাত্র। নলিকামধ্যে সূত্রসঞ্চার ও তাহা অন্যভাবে প্রদর্শন, ছেদন ও দহন প্রভৃতি করিয়া সূত্রকে পুনর্ব্বার অচ্ছিন্ন ও অদগ্ধ ভাবে দেখান। সূত্র সাহায্যে শূন্যমার্গে দেবতা প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য্য।

(২৭) বিনাডমরুকবাদ্যানি—ইহা স্পষ্ট।

(২৮) প্রহেলিকা—কবিতার গুপ্ত অর্থের জ্ঞান (হেঁয়ালি)।

(২৯) প্রতিমালা—অন্ত্যাক্ষরিকা নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক শ্লোকের অন্ত্যাক্ষর সন্ধান করতঃ পরস্পর শ্লোক পাঠের সঙ্কেত। কাব্যে উহার প্রয়োজন।

(৩০) দুর্ব্বচযোগ—শব্দতঃ ও অর্থতঃ যাহা অতিকষ্টে বলা যায়। ক্রীড়ার্থে বা বাদ্যার্থে ইহার প্রয়োজন। কাব্যাদর্শে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। জয়মঙ্গলা টীকাও দ্রষ্টব্য।

(৩১) পুস্তকবাচনম্—রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির বর্ণিত বিষয় নায়কের ভাবানুসারে স্বরবিন্যাস যোগে বাচন (পুরাণ পাঠ ও কথকতা প্রভৃতি)।

(৩২) নাটকাখ্যায়িকাদর্শনম্—অভিনয় প্রভৃতি।

(৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণম্—ইহা স্পষ্ট ও সকলেরই জ্ঞাত।

(৩৪) পত্রিকাবেত্রবানবিকল্পঃ—খট্টা প্রভৃতিতে বেতের ছাউনি দেওয়ার কার্য্য।

(৩৫) তক্ষকর্ম্মাণি—(তকু কর্ম্ম) টেকোর কাজ, কুঁদান কার্য্য।

(৩৬) তক্ষণম্—চাঁছা, ছোলা প্রভৃতির কর্ম্ম (সূত্রধরের কার্য্য)।

(৩৭) বাস্তুবিদ্যা—গৃহাদি নির্ম্মাণ কর্ম্ম (Engineering)।

(৩৮) রূপ্যরত্নপরীক্ষা—জহুরীর কার্য্য।

(৩৯) ধাতুবাদঃ—ক্ষেত্রবাদ—মৃত্তিকা, প্রস্তর, রত্ন ও ধাতু প্রভৃতির পাতন (ঢালা, শোধন, মিলন ইত্যাদির জ্ঞান)।

(৪০) রত্নরাগাকরজ্ঞানম্—স্ফটিকাদি মণির বর্ণ বিজ্ঞান এবং পদ্মরাগ প্রভৃতির আকর জ্ঞান (Mining)।

(৪১) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগঃ—বৃক্ষ রোপণ, বৃক্ষের পোষণ, চিকিৎসা ও বিচিত্রতা সম্পাদন, উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ বিষয়ক জ্ঞান।

(৪২) মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধিঃ—ইহা স্পষ্ট। ভারতের অনেক স্থানে এই প্রকার ক্রীড়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

(৪৩) শুকসারিকাপ্রলাপনম্—ময়না, মদনা প্রভৃতি স্ফুটবাক্ পক্ষীকে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া। পাখী পড়ান—ইহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

(৪৪) উৎসাদনে, সংবাহনে, কেশমর্দ্দনেচ কৌশলম্—মর্দ্দন দ্বিবিধ—পদদ্বারা ও হস্তদ্বারা, সংবাহন (হাত পা টিপিয়া দেওয়া)।

(৪৫) অক্ষরমুষ্টিকাকথনম্—সাঙ্কেতিক লিখন জ্ঞান, ইহা

দুই প্রকার—(১) সাভাসা ও নিরাভাসা। তন্মধ্যে সাভাসা "অক্ষর-মুদ্রা" নামে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ঠারে কথা বলা। আচার্য্য রাধগুপ্ত "চন্দ্রপ্রভবিচার" নামক কাব্যে ইহার একটী প্রকরণ পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"গহন প্রসন্নসর্ব্বাং কতিপয়সূত্রামিহামন্তমুখীম্।
অনধীতাক্ষরমুদ্রাং বাদসমুদ্রে পরিপ্লবতে॥"

"নিরাভাসা" অক্ষরমুষ্টিকাকে "ভূতমুদ্রা" বলা হয়। গুহ্যবিষয় সাধারণের সমক্ষে অভিপ্রেত ব্যক্তির জ্ঞানার্থ বলার কৌশল। ইহা মুষ্টি কিশলয়, ছুটা, ত্রিপতাকিক, পতাকা অঙ্কুশ ও মুদ্রা, এই সপ্তবর্গে বিভক্ত। ভূতমুদ্রা প্রয়োগে অঙ্গুলি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং অঙ্গুলিপর্ব্ব স্বরবর্ণ প্রকাশক। এতদুভয় সংযোগে সংযুক্তাক্ষর প্রকাশ করা যায়। Deaf and Dumb School গুলিতেও বোধ হয় এই পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৪৬) ম্লেচ্ছিতবিকল্পঃ—সাধুশব্দ কথিত হইলেও, অক্ষরের কুটিল বিন্যাসে যাহা অস্পষ্টার্থ হয়। ইহা গূঢ় বস্তু জানাইবার কৌশল। দৃষ্টান্ত কামসূত্রের টীকায় দ্রষ্টব্য। মহাভারতেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। মহাত্মা বিদুর এই বিদ্যার সাহায্যেই পাণ্ডবগণকে যতুগৃহে বাসকালে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। "ম্লেচ্ছিত কবিকল্প-কলা" নামক একখানি গ্রন্থে এই বিদ্যার উপদেশ আছে।

(৪৭) দেশভাষা-বিজ্ঞানম্—ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষাজ্ঞান।

(৪৮) পুষ্পশকটিকা—কোনও পুষ্পের নাম করিলে, প্রশ্ন কর্ত্তা যে পুষ্পের নাম বলিবেন, তদনুসারে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে শুভাশুভ ফল নির্ণয় করার শাস্ত্র। ইহা ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের অঙ্গ বিশেষ।

(৪৯) নিমিত্তজ্ঞানম্—ইহাও ফলিত জ্যোতিষের অঙ্গ।

(৫০) যন্ত্রমাতৃকা—এইটী এক প্রকার শাস্ত্র, ইহা বিশ্বকর্ম্ম-কথিত। সজীবানাং যন্ত্রাণাং বানোদকসংগ্রহার্থং ঘটনাশাস্ত্রং বিশ্বকর্ম্মণা প্রোক্তম্। এই গ্রন্থের নাম "বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ।" সজীব যন্ত্র—রথ, শকট, তৈলযন্ত্র, ইক্ষুযন্ত্র প্রভৃতি অর্থাৎ যে সমস্ত যন্ত্র গো, মহিষ, অশ্বাদি দ্বারা চালিত হয়; এবং নির্জ্জীব যন্ত্র যাহা অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি জড়শক্তি সাহায্যে ক্রিয়া করে। বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশে রণতরী, রক্ষিণরী, ব্যোমযান, পুষ্পকরথ, আগ্নেয়রথ, বাণধ্বজরথ, গর্দ্দভযান, পুষ্করযান, বিধ্বংশিনী তরণী প্রভৃতি বহু প্রকার নির্জ্জীব যানের নির্ম্মাণ কৌশল কথিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে বোধ হয় প্রাচীন ভারতের অনেক অদ্ভুত তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যে বহুল চর্চ্চা পুরাকালে ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহাও প্রমাণিত হইবে। অনেকে হয়ত এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে পারেন যে, বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশে কথিত নির্জ্জীব যানাদির কোনও পরিচয় আমরা পাই না কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বহু বিপ্লবে ভারতের অনেক রত্নই নষ্ট হইয়াছে। আজ যাহা নয়নগোচর হইতেছে না, তাহারই যে অস্তিত্ব ছিল না এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। কালে অনেক বিষয়ই অনুসন্ধান দ্বারা প্রকটিত হইবে আশা হয়।

(৫১) ধারণমাতৃকা—শ্রুতগ্রন্থাদি মনে রাখিবার সঙ্কেত বিশেষ। ইহা দ্বারা শ্রুতিধর হওয়া যায়।

(৫২) সংপাঠ্যম্—ক্রীড়ার্থ মিলিত হইয়া গ্রন্থ পাঠ। একজন গ্রন্থ পাঠ করিবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এই অশ্রুতপূর্ব্ব গ্রন্থ

পূর্ব্বব্যক্তির সহিত একযোগে পাঠ করিবে। ইহা কি তাহা বুঝা যাইতেছে না।

(৫৩) মানসী—মনে মনে চিন্তা। তাহা দৃশ্য ও অদৃশ্যভেদে দ্বিবিধ। ইহার বিস্তৃত বিবরণ কামসূত্রের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(৫৪) কাব্যক্রিয়া- সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ কাব্যাদি রচনা কৌশল। ইহা অলঙ্কার শাস্ত্রেরই অংশ বিশেষ।

(৫৫) অভিধানকোষঃ—অমর, হেম, বিশ্ব প্রভৃতি অভিধান অভ্যাস করা।

(৫৬) ছন্দোজ্ঞানম্—শিক্ষা প্রভৃতি ছন্দশাস্ত্র অভ্যাস করা।

(৫৭) ক্রিয়াকল্পঃ—অলঙ্কার ও কাব্যশাস্ত্রের অভ্যাস ও জ্ঞান।

(৫৮) ছলিতকযোগঃ—ছলনা করিয়া রূপান্তর ধারণ করত অন্যকে প্রতারিত করা (বোধ হয় সং দেওয়া)।

(৫৯) বস্ত্রগোপনানি—ইহা এক প্রকার বাজি। বস্ত্রদ্বারা অপ্রকাশ্যদেশ এরূপ ভাবে আবৃত করা যায় যে, সেই বস্ত্র বারংবার উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত বা আকুঞ্চিত প্রসারিত করিলেও সেই স্থান হইতে বস্ত্র স্খলিত হইবে না। ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডকে অচ্ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় প্রদর্শন। বিশাল বস্ত্রকে অল্পীকরণ প্রভৃতি কৌশল।

(৬০) দ্যূতবিশেষাঃ—নানা প্রকার খেলা—পাশা দাবা ইত্যাদি। যশোধরকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৬১) আকর্ষক্রীড়া—পাশা খেলা ; ইহা দ্যূতের অন্তর্গত হইলেও পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(৬২) বালক্রীড়নকানি—কন্দুক (বল প্রভৃতি) খেলা ও বালকদের খেলার জন্য নানাপ্রকার পুত্তলিকা প্রস্তুত করার কৌশল।

(৬৩) বৈনয়িকীজ্ঞানম্—হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুকে বিনীত করার উপায়।

(৬৪) বৈজয়িকীনাং ব্যায়ামিকীনাং চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্—বৈজয়িকী বিদ্যা দ্বারা বিজয়লাভ করা যায়; ইহা দুই প্রকার—(১) দৈবী ও (২) মানুষী। তন্মধ্যে অপরাজিতা প্রভৃতি তন্ত্রে দৈবী বিদ্যা উক্ত হইয়াছে এবং মানুষী বিদ্যা ধনুর্ব্বেদাদিতে কথিত হইয়াছে। ব্যায়ামিকাবিদ্যা ব্যায়াম ও মৃগয়াদি ব্যাপার (Gymnastics and Hunting etc.)

পূর্ব্বোক্ত ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যা কামসূত্রেরই অবয়বীভূত বাৎস্যায়ন মুনি এইপ্রকার বলিয়াছেন। শৈবাগমোক্ত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা কামসূত্রেরই অনুরূপ, অতএব সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তন্ত্রান্তরে চতুঃষষ্টি মূলকলাবিদ্যা নিম্নলিখিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—

(ক) "অত্র কর্ম্মাশ্রয়াশ্চতুর্বিংশতিঃ—তদ্‌যথা (১) গীতম্, (২) নৃত্যম্ (৩) বাদ্যম্, (৪) লিপিজ্ঞানম্, (৫) বচনকৌশলম্, (৬) চিত্রবিধিঃ, (৭) পুস্তকর্ম্ম, (৮) পত্রচ্ছেদ্যকম্, (৯) মাল্যবিধিঃ, (১০) আস্বাদ্যবিধানম্, (১১) রত্নপরীক্ষা, (১২) সীব্যম্, (১৩) রথপরিজ্ঞানম্, (১৪) উপকরণক্রিয়া, (১৫) মানবিধিঃ, (১৬) আজীবজ্ঞানম্, (১৭) তির্য্যগ্‌যোনিচিকিৎসিতম্, (১৮) মালাকৃতম্, (১৯) পাষণ্ডসমরজ্ঞানম্, (২০) ক্রীড়াকৌশলম্,

(২১) লোকজ্ঞানম্, (২২) বৈচক্ষণ্যম্, (২৩) সংবাহনম্, (২৪) শরীরসংস্কারবিশেষকৌশলঞ্চেতি।

(খ) দ্যূতাশ্রয়া বিংশতিঃ—তত্রনির্জীবাঃ পঞ্চদশ—তদ্‌যথা—(১) আয়ুঃপ্রাপ্তি, (২) অক্ষবিধানম্, (৩) রূপসংখ্যা, (৪) ক্রিয়া-দর্শনম্, (৫) বীজগ্রহণম্, (৬) নয়জ্ঞানম্, (৭) করণাদানম্, (৮) চিত্রাচিত্রবিধিঃ, (৯) গূঢ়রাশিঃ, (১০) তুল্যাভিহারঃ, (১১) ক্ষিপ্রগ্রহণম্, (১২) অনুপ্রাপ্তি-লেখাস্মৃতিঃ, (১৩) অগ্নিক্রমঃ, (১৪) ছলব্যামোহনম্, (১৫) গ্রহদানঞ্চেতি।

(গ) সজীবা পঞ্চঃ—(১) উপস্থানবিধিঃ, (২) (৩) যুদ্ধম্, (৪) গতম্, (৫) নৃত্তঞ্চেতি।

(ঘ) শয়নোপচারিকাঃ ষোড়শ তদ্‌যথা—(১) পুরুষস্য ভাব-গ্রহণম্, (২) স্বরাগপ্রকাশনম্, (৩) প্রত্যঙ্গদানম্, (৪) নখদন্তয়ো-বিচারৌ, (৫) নীবীস্রংসনম্, (৬) গুহ্যস্য সংস্পর্শানুলোম্যম্, (৭) পরমার্থকৌশলম্, (৮) হর্ষণম্, (৯) সমানার্থকৃতার্থতা, (১০) অনুপ্রোৎসাহনম্, (১১) মৃদুক্রোধপ্রবর্ত্তনম্, (১৪) সুপ্ত-পরিত্যাগঃ, (১৫) চরমস্বাপবিধিঃ, (১৬) গুহ্যগূহনঞ্চেতি।

(ঙ) চতস্র উত্তরকলাঃ তদ্‌যথা—(১) সাশ্রুপাতং রমণায় শাপনম্, (২) স্বপাতক্রিয়া, (৩) প্রস্থিতানুগমনম্, (৪) পুনঃ পুনর্নিরীক্ষণঞ্চ।

ইতি চতুঃষষ্টিমূলকলাঃ—আস্বেবান্তরনিবিষ্টানামন্তরকলানামষ্টাদশা-ধিকপঞ্চতান্যুক্তানি। (৫১৮); তত্র কর্ম্মদ্যূতাশ্রয়ণং প্রায়শঃ আবালং গচ্ছতি। তা এবান্যথা বিভজ্য চতুঃষষ্টিরত্রোক্তাঃ। যাস্ত শয়নোপ-চারিকা উত্তরকলাশ্চ তাঃ প্রায়শস্তন্ত্রস্যাঙ্গতাং (কামশাস্ত্রস্যাঙ্গতাং)

প্রতিপন্তব্যে ইতি পাঞ্চালিক্যামেব চতুঃষষ্ট্যনন্তরাঃ কলা বেদিতব্যাঃ ইতি।

এতদ্ব্যতীত সুবিখ্যাত শুক্রনীতি গ্রন্থ পাঠেও চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা সম্বন্ধে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে বহুল উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব (শাক্যসিংহ) চতুঃষষ্টি-নিপুণা এবং অন্যান্য বিদ্যাসম্পন্না কন্যা ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিবেন না, এই প্রকার প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলে গোপানাম্নী রাজকন্যা এতাদৃশ গুণসম্পন্না জানিয়া তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। একথা বোধ হয় বুদ্ধচরিত পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম করতঃ অজ্ঞাতবাস কালে বিরাট-রাজদুহিতা উত্তরাকে নৃত্যগীতাদির শিক্ষা দিয়াছিলেন, একথা মহাভারত পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। প্রাচীন কালে রাজকন্যাগণ নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় সুনিপুণ হইতেন, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজবিলাপ বর্ণনকালে বলিতেছেন :—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে মল্লিনাথ বলিয়াছেন—
"ললিতে মনোহরে কলাবিধৌ বাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলাপ্রয়োগে প্রিয়শিষ্যা ইত্যাদি।" যতদূর জানা যায় তাহাতে বোধ হয়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার রীতিমত চর্চ্চা হইয়া আসিতেছিল। কালের কুটিল আবর্ত্তনে এবং নানা প্রতিকূল

কারণে ভারত এখন পূর্ব্বগৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অধুনা আর চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার রীতিমত আলোচনা হয় না। পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে Fine art বলা হয়, তদপেক্ষা কলাবিদ্যা যে বহুব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। লৌকিক প্রায় সমস্ত বিদ্যাই কলাবিদ্যার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কলা—কৌশল অর্থেই বোধ হয় ব্যবহৃত হইয়াছে, অথবা অংশ অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। Fine arts ললিত কলা নামে অভিহিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকেরই ধারণা এই যে, প্রাচীন ভারতে কেবলমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, পরন্তু ব্যবহারিক বিদ্যা (Practical science) প্রভৃতির আলোচনা ছিল না; ইহাতেই ভারতবর্ষের অধঃপতন ও দুর্দ্দশা। কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা এ মতের অসমীচীনতা প্রতিপন্ন হয় না কি? যন্ত্রমাতৃকা কলাতে কত প্রকার ব্যবহারিক যান নির্ম্মাণাদির প্রসঙ্গ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফলতঃ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ না করায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হইয়াছে, এই জন্যই হিন্দুমাত্রেরই সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুখের বিষয়, অধুনা অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত সুধীব্যক্তি প্রাচীন ভারতের জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতির যথাযথ বিবরণ অবগত হইবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন। ভরসা করি, ইহার পরিণাম শুভ হইবে।

অনেকের মুখেই শুনিতে পাই যে—বাৎস্যায়ন মুনির প্রণীত কামসূত্র একখানা অশ্লীল ও অপাঠ্য গ্রন্থ। যাঁহারা মনোনিবেশ সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহাদের এই ভ্রান্তি থাকিতে

পারে না। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় এবং তাৎকালিক ভারতের অনেক বিষয়েই জ্ঞান হয়। ইতিপূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ অশেষশাস্ত্রে পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় এই গ্রন্থাবলম্বনেই মধ্য যুগের ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, এবং তিনি আমাদিগকে অনেক অজ্ঞাত পূর্ব্ব-বিষয়ের বিবরণ অবগত করাইয়াছেন। আমিও অদ্য তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করতঃ কলা-বিদ্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিফল প্রয়াস করিলাম। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয়।

কামসূত্রকে যাঁহারা অপাঠ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয় বৈরাগ্যলাভ। এ কথা আপাততঃ বিস্ময়জনক মনে হয় বটে, কিন্তু বাৎস্যায়ন স্বয়ং গ্রন্থশেষে কামসূত্রের উদ্দেশ্য এই প্রকার বলিয়াছেন, অতএব আমাদের তাঁহার বিরুদ্ধে বলিবার অধিকার নাই। শ্রীমদ্ মধুসূদন সরস্বতীও প্রস্থান-ভেদে কামশাস্ত্রের প্রয়োজন বিষয়-বিতৃষ্ণা-লাভ, এই কথাই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। যাহা বলা হইল, তাহা হইতে কামসূত্রগ্রন্থ যে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা সকলেই বুঝিবেন।

উপসংহারে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত সুধীগণ যেন প্রাচীন ভারতের অমূল্য রত্নভাণ্ডার হইতে রত্নাহরণে বিমুখ না হন। আমাদের গৃহের নিভৃত কক্ষে অনেক অমূল্য রত্ন হেলায় নষ্ট হইতেছে, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে আমরা ক্রমেই হীন ও দরিদ্র হইয়া যাইব।

অভিভাষণ।

"নানাবেদ-পুরাণদর্শনকথাবিজ্ঞান কাব্যস্মৃতি
ছন্দো ব্যাকরণাভিধানগণিতালঙ্কারপারগতাঃ।
যস্যাস্তে তনয়া গুণৈকনিলয়া বাণীপ্রিয়া সন্ততং
শ্রীমদ্ভারতমাতরং ভগবতীং তাং রত্নগর্ভাং ভজে॥

যাঁহার কৃপাবিন্দু—

"বাচালং বিকলং খলং শ্রিতমলং কামাকুলং ব্যাকুলং।
চণ্ডালং তরলং নিপীতগরলং দোষাবিলঞ্চাখিলম্॥"

করে, তাঁহারই মঙ্গলময় ইচ্ছায় বঙ্গের বাণীপুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যের চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ মানসে, বঙ্গের সুদূর প্রান্তস্থিত মানস-সরোবরোত্থিত পবিত্র ব্রহ্মপুত্র-নদের তীরবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র ময়মনসিংহ নগরীতে আগ্রহান্বিত ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সমবেত হইয়াছেন; ইঁহাদের সমাগমে এই নগরী অদ্য পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অদ্যকার এই মিলন ময়মনসিংহের ভবিষ্য ইতিহাসে একটী চিরস্মরণীয় দিবস বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইবে। ইতঃপূর্ব্বে ময়মনসিংহের পক্ষে এই প্রকার ভাগ্যোদয় আর কখনও হয় নাই। মিলনক্ষেত্র মাত্রই চির-কাল ভারতে তীর্থক্ষেত্ররূপে ঘোষিত হইয়াছে নৈমিষারণ্য প্রভৃতি ঋষিদিগের মিলনস্থান ভারতবর্ষে পবিত্র তীর্থ। সমাগত ভদ্র-

মহোদয়গণের অনেকেই বহুক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও, এক মহান্ উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা কি দিয়া আজ তাঁহাদের সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করিব, কি উপকরণে অতিথি-সৎকার করিব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; তবে এই মাত্র জানি যে, "গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা হয়"; সেই ভরসাতেই হীন সম্বল হইয়াও, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি উপহারসহ ভক্তবৃন্দের অভ্যর্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি; ভরসা করি, আমাদের এই উপহার উপেক্ষিত হইবে না। বহুতর যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্বেও আমার উপর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির পদ অর্পিত হওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি; কিন্তু আমি এই বরণীয় পদোচিত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব কি না, তাহা বলিতে পারি না। সমগ্র ময়মনসিংহবাসীর পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগত ভাবে হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া মহোদয়গণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলনীর শুভ উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া আমাদের সর্ব্ব প্রকার ত্রুটি মার্জ্জনা করুন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনী আজ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, অতএব ইহার এখনও শৈশবাবস্থা। যাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছায় বিগত তিনবর্ষ ক্রমান্বয়ে বহরমপুরে, ভাগলপুরে ও রাজসাহীতে ইহার বাৎসরিক অধিবেশন কার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারই অপার করুণাবলে বর্ত্তমান অধিবেশনের কার্য্যও সুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং সম্মিলনী ক্রমে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করতঃ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবে। বাণীবিদ্যা-

বিধায়িনী, শ্বেতপদ্মাসনা, বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তা সর্ব্বশুক্লা বাগ্‌দেবী আমাদের কার্য্যের সহায় হউন।

যে বঙ্গভাষা বহুকাল উপেক্ষিতা হইয়া দীনহীনা বেশে বঙ্গগৃহে বিরাজমানা ছিলেন, তিনি সম্প্রতি কোন অদৃশ্য মন্ত্রশক্তিবলে উদ্বোধিতা হইয়াছেন ; চারিদিক হইতে কি যেন একটা উৎসাহের প্রবল উদ্দীপনা আসিয়া নিদ্রিতা ভাষাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এখন আর তিনি দীনা, কৃশা ও উপেক্ষিতা নহেন, তিনি ক্রমে হৃষ্ট-পুষ্টা লাবণ্যময়ী ও সর্ব্বাভরণ ভূষিতা হইয়া আমাদের সমক্ষে বরাভয় হস্ত লইয়া তাঁহার লাবণ্যচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করতঃ কল্যাণ-ময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছেন। আসুন, আমরা সকলে তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণত হই, তিনি আমাদের প্রতি কৃপানেত্রে চাহিবেন এবং আমাদের অশেষ কল্যাণ বিধান করিবেন। ভাই বঙ্গবাসিগণ! তোমরা সকলে তাঁহার গলদেশে নানারত্ন বিভূষিত কণ্ঠহার পরাইয়া দাও, তিনি জগতের সমক্ষে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীরূপে দণ্ডায়মানা হউন এবং আমরাও তাঁহাকে দেখিয়া দুর্লভ মানব জন্ম সফল করি।

বঙ্গভাষায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্রোতঃস্বতী সমূহ, কোনটী বা নির্ম্মল বারিরাশি বহন করতঃ, কোনটী বা নানাবিধ আবর্জ্জনাপূর্ণ পঙ্কিল জলরাশি ধারণ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে অথবা প্রবল তরঙ্গভঙ্গ বিস্তার করতঃ বঙ্গসাহিত্যরূপ বিশাল সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে; এই গুলির সমস্ত সুস্বাদুতোয়া নহে, তথাপি সকলেরই গতি সাগরা-ভিমুখী। সাহিত্যসাগরেও নানাবিধ রত্ন ও নক্র-কুম্ভীরাদি বর্ত্তমান, কিন্তু সাহিত্যের অতলস্পর্শ জলধিগর্ভ হইতে নিপুণ রত্নগ্রাহীর ন্যায়

বহুমূল্য রত্নরাজি আহরণ করতঃ সুশোভন মালা গ্রথিত করিয়া বঙ্গভাষার গলদেশে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে অপূর্ব্বশ্রীসম্পন্ন ও মহিয়সী করিয়া তুলাই আমাদের কর্ত্তব্য; ইহা করিতে পারিলেই আমাদের জাতীয় গৌরব রক্ষিত হইবে এবং সম্মিলনীর জন্মগ্রহণেরও সার্থকতা হইবে।

বঙ্গসাহিত্য ও ভাষা কতকালের এবং তাহার মূল প্রস্রবণ কোথায়, এ সমস্ত তত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রয়াস আমার অধিকার-বহির্ভূত; অতএব অদ্য এ বিষয়ের কোনও আলোচনা সমীচীন নহে। মহাকবি জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী হইতেই যে চিরকোমলতাময়ী সুললিত বঙ্গভাষা ক্রমে উন্মেষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অপরিসীম প্রতিভাদ্বারা যে তাহা ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতঃপর কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, দাশরথি রায়, নিধু বাবু প্রভৃতি কবিগণ এবং রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারিচাঁদ সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত গুপ্ত, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহামনস্বী বঙ্গসন্তানগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং প্রতিভাবলে বঙ্গভাষা আজ মোহনমূর্ত্তিতে আমাদের নয়ন পথবর্ত্তিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার এই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া জগৎবাসী বিমুগ্ধ হইয়াছে এবং

আমাদের আশা হইতেছে, তিনি অচিরাৎ ভাষা-জগতে অতি রমণীয় স্থান অধিকার করিবেন।

ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য; বাঙ্গালী হইয়া যিনি বঙ্গভাষার আলোচনায় হতশ্রদ্ধ, তিনি নিতান্ত হতভাগ্য। এতাদৃশ ব্যক্তি অন্য বহু গুণান্বিত হইলেও তিনি প্রশংসার্হ নহেন। বর্ত্তমান কালে আমরা যে প্রবলপরাক্রান্ত, পরম-বিদ্যোৎসাহী ও অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন জাতির শাসনাধীনে বাস করিতেছি, তাঁহাদের কৃপায় পৃথিবীর নানা ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলেই আমরা ঐ সমস্ত ভাষার রত্নরাজি আহরণ করতঃ বঙ্গভাষার রত্নভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারি। এই সুযোগ অবহেলায় হারাণ আমাদের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে না। পক্ষান্তরে সে সমস্ত আমাদের গৃহকোণে ধূলিধূসরিত অবস্থায় হতাদরে ক্রমে বিলয়দশা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সময় থাকিতে সতর্কতা অবলম্বন সর্ব্বথা বিধেয়। পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহার বৃদ্ধিসাধন চেষ্টাই সুধীজনসম্মত। পরধনে সমৃদ্ধ হওয়া তত সহজসাধ্য নহে।

বঙ্গভাষায় বহু কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রহসন প্রভৃতি রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু নিতান্ত লজ্জা ও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তন্মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থের রুচি এতই বিকৃত যে, তদ্দ্বারা ভাষার অঙ্গপুষ্টি না হইয়া পক্ষান্তরে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইতেছে এবং দেশেরও মহা অনিষ্ট হইতেছে। সময়োচিত ভেষজ প্রয়োগদ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে না পারিলে, ক্রমে ভাষার

দুর্ব্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহার দুরবস্থারও একশেষ হইবে। ভরসা করি, সম্মিলনী উপযুক্ত ভেষজ প্রয়োগের চেষ্টা করিবেন। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভৈষজ্যতত্ত্ব বিষয়ক ও গণিতাদি শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরল প্রচার। সুখের বিষয়, অধুনা এবম্বিধ গ্রন্থাদি প্রচারের সময়োচিত প্রয়াস দেখা যাইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ বটে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, রত্নতত্ত্বাদি বিষয়ে কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু বঙ্গের কোনও কোনও সুসন্তান এ সকল বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশেও মনোনিবেশ করিয়াছেন, ভরসা হয় অচিরে বঙ্গভাষার এ সমস্ত অভাব পূর্ণ হইবে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতে হইলেই কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্" ও "সাহিত্য সভা" প্রভৃতি বোধ হয় এ বিষয়ে সমুচিত চেষ্টা করিবেন এবং করিতেছেন।

প্রাচ্যজ্ঞান (পারমার্থিকজ্ঞান) ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের (জড়-বিজ্ঞান, গণিত ও শিল্প-শাস্ত্রাদির) সমন্বয় সাধন দ্বারাই সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং সভ্যতার বোধ হয় ইহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রকার চেষ্টা যত সত্বর ফলবতী হওয়া সম্ভবপর, পৃথিবীর অপর কোন জাতির পক্ষে তাহা তত অনায়াস-সাধ্য নহে। আমার মনে হয় বাঙ্গালীই এই সমন্বয়ের প্রধান পথ প্রদর্শক হইবেন এবং ভারতবর্ষে বঙ্গভাষাই এ সম্বন্ধে অগ্রগণ্য হইবে। অদ্য যে মহাত্মাকে আমরা সভাপতির পদে বরণ করিতে আহ্বান করিয়াছি এবং যাঁহার ছাত্রগণ মধ্যে আমি অন্যতম বলিয়া একটু গর্ব্ব করিতেও সাহসী হইতেছি সেই স্বনামধন্য, বিশ্ব-

বিশ্রুতকীর্ত্তি অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা স্বোদ্ভাবিত অপূর্ব্ব যন্ত্রসাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভারতের সনাতন বেদবাক্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে তিনি জগতের সমক্ষে ইহাও দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুর প্রতিভা নির্ব্বাণোন্মুখ হইলেও অদ্যাপি তাহা একেবারে ভস্মীভূত হয় নাই, তাহাতে জ্ঞানের ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে, তাহা পূর্ব্ববৎ পুনঃ সমুজ্জ্বল হইবে এবং তাহার পবিত্র এবং স্নিগ্ধ রশ্মিজালে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিতে পারে। "একং সৎবিপ্রাবহুধা বদন্তি" এই বৈদিক বাক্যের সত্যতা ক্রমেই পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া তাঁহাদিগকেও বিস্মিত করিয়াছে। বঙ্গের সুসন্তানের এই কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিবে।

এই জন্যই বলিতে সাহসী হইয়াছি যে, বঙ্গবাসীই সর্ব্বাদৌ জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয় প্রদর্শনের পন্থা দেখাইবেন। সে দিন বোধ হয় বহুদূরবর্ত্তী নয়, যে দিন পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই গভীর বেদবাক্য মেঘমন্দ্র স্বরে প্রতিধ্বনিত হইবে এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিগণ যে একসময়ে জ্ঞানের উচ্চসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হইবে এবং সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে তাঁহাদের চরণে ভক্তিভাবে প্রণত হইবে।

আজিকার আনন্দের দিনে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট ৺রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যদিও নশ্বর দেহে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান

নাই, তথাপি তাঁহার অমর আত্মা মানব চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে আমাদের এই সম্মিলনীর উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না, এবং আমাদের উপর অমোঘ আশীর্ব্বাদরাশি বর্ষণ করিতেছেন না, তাহা কে বলিতে পারে? চন্দ্রকান্তের প্রতিভার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিজাল চিরতরে তিরোহিত হইলেও, তাহার কিরণচ্ছটায় যে বঙ্গের প্রতিগৃহ আলোকিত হইয়াছে তাহা নিভিয়া যাইবে না। রজনীকান্তের বীণা নীরব হইলেও তাঁহার বাণী আজও আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া"—প্রাণ মন আকুল করিতেছে: চন্দ্রনাথের গভীর গবেষণার গম্ভীর ধ্বনি অদ্যাপি আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইঁহারা সকলেই শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যশোরাশি চিরকাল তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিবে; অতএব এই আনন্দের দিনে তাঁহাদের জন্য আর অশ্রুপাত করিয়া তাঁহাদের আত্মার অকল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছা করি না। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" ভগবদ্‌বাক্য মনে রাখিয়া শোক সম্বরণ করতঃ ভগবানের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, অচিরে ইঁহাদের স্থান ও অভাব পূর্ণ হউক, ভগবান আমাদের কাতর প্রার্থনা অবশ্য শুনিবেন।

আমি অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করতঃ আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি, এই জন্য সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যের তরুমূলে সুশীতল বারি সেচন মানসে যে সমস্ত মহাজন সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং প্রযত্নে এই তরু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতঃ অচিরে মুকুলিত হউক এবং

তাহা কালে সুদৃশ্য পুষ্পে বিশোভিত এবং সুমধুর ফলভরে অবনত হইয়া তাহার স্নিগ্ধ ছায়া দানে বঙ্গসন্তানগণকে অপার শান্তি প্রদান করুক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। বাণীচরণাশ্রিত বাণী-পুত্রগণের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনেই আমাদের অধিকার মাত্র ফলাফল তাঁহারই হাতে। আসন গ্রহণ করার পূর্ব্বে "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতুঃ" বলিয়া পুনরপি সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি. এবং উপসংহারে নিবেদন করিতেছি যে—

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হনিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

সংস্কৃতভাষা চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা।

সংস্কৃত দেবভাষা। কিন্তু এই দেবভাষা ভারতীয় আর্য্যগণের মাতৃভাষা। পদমাধুর্য্যে, শব্দবৈভবে এবং ভাবগাম্ভীর্য্যে ও বর্ণনা-বৈচিত্র্যে ইহা জগতে অতুলনীয়। যখন পৃথিবীর অপরাপর দেশ ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন, ভারতে তখন এই ভাষায় বেদ ধ্বনিত সামগান উদ্গীত, উপনিষদ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রথিত এবং কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়া জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিতেছিল। কি লাটিন, কি গ্রীক্, কি আরব্য, কি পারসিক, কি টেনিক প্রভৃতি প্রাচীন অথবা বর্ত্তমান ইউরোপীয় ভাষাবলীর কোনটিই সংস্কৃতের সহিত তুলনীয় নহে। সংস্কৃত কতকালের প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা দ্বারাও এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। হিন্দুর বিশ্বাস, ইহা অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান Philology) প্রভৃতি সংস্কৃত চর্চ্চারই ফল। মুসলমানের আধিপত্য সময়ে, ভারতের বহু সংস্কৃত অমূল্য গ্রন্থ বিদ্বেষ বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই ভস্মরাশিতে মানবীয় প্রতিভার কি মহার্ঘ রত্নরাশি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কে বলিবে? ইহা শুধু হিন্দুজাতির নহে, মানব জগতের দুর্ভাগ্য। এখন "গতস্য শোচনা নাস্তি" বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া ব্যতীত

উপায়ান্তর নাই। সুসভ্য ও পরম বিদ্যোৎসাহী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় অনেক প্রাচীন বিলুপ্ত প্রায় সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। হিন্দুজাতি এই মহান্ উপকারের জন্য ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

সংস্কৃত মৃত-ভাষা,—অর্থাৎ লোকের দৈনন্দিন কর্ম্মে ইহার ব্যবহার নাই সত্য, কিন্তু এই মৃত-ভাষার আত্মা যে ভারতীয় ভাষা সমূহে এবং ইহার ভাবরাজি হিন্দুর প্রাত্যহিক জীবনে ওতঃপ্রোত-ভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যতকাল হিন্দুর বেদ, পুরাণ প্রভৃতি পৃথ্বীতলে বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিলুপ্ত হইবে না। অথবা প্রলয়েও বুঝি বা ইহার বিলয় ঘটিবে না। হিন্দুজাতির প্রকৃতি, স্থিতি ও গতি এবং মানব জাতির জ্ঞানের প্রথমোন্মেষ সম্বন্ধে তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন অপরিহার্য্য। ইলিয়েড্, ইনিয়েড্, প্যারাডাইজ লষ্ট ও প্যারাডাইজ রিগেনড্ পাঠ করা যদি অবশ্য-কর্ত্তব্য হয়, তবে রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করাও অবশ্য-কর্ত্তব্য। সেক্ষপীয়র রচিত নাটকাবলী পাঠ করিলে মনে যদি অপূর্ব্ব আনন্দানুভব হয়, তবে মহাকবি কালি-দাস ও ভবভূতির রচিত অতুলনীয় নাটকসমূহও অবশ্যপাঠ্য। সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। অতএব সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ একান্তই প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করিতে হইলে, ইয়ুরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে হইলেও, সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী হওয়া একান্ত

আবশ্যক। অধুনা ইয়ুরোপীয় সভ্য জগতের সুধীগণ যদিও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে তাঁহাদিগের নীরস জড়বিজ্ঞানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে এক নূতন আভা প্রদর্শন করিতেছেন, তথাপি অধ্যাত্ম জ্ঞানের পুরাতন ভাণ্ডার সংস্কৃতে উপেক্ষা করিলে, এ তত্ত্বে প্রকৃত উন্নতি লাভের উপায়ান্তর নাই। ভারতীয় মহর্ষিগণ আধ্যাত্মিক বলে, এবং ইয়ুরোপীয় সুধীগণ বিজ্ঞান বলে বলীয়ান্। তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনই যদি মানবীয় উন্নতির চরম আদর্শ হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ও ইয়ুরোপীয় উভয়বিধ ভাষায় জ্ঞানলাভ করা সমানরূপে প্রয়োজনীয়। কেবল ইংরেজী অথবা কেবল সংস্কৃত পাঠে কখনও এই অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের আলোচনা একান্ত উচিত। এ বিষয়ে, বোধ হয়, কাহারও মতদ্বৈধ নাই। বর্ত্তমান কালে স্কুল ও কলেজে সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয় সত্য, কিন্তু স্কুল প্রভৃতিতে যে প্রণালীতে যতটুকু সংস্কৃত শিক্ষা দান করা হয়, তাহাতে এই দুরূহ ভাষায় প্রকৃত অধিকার লাভ করার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। ব্যাকরণ ও অভিধান সংস্কৃত ভাষার দুইটী চক্ষু স্বরূপ। পাণিনি, ব্যাড়ী, শাকটায়ন, ইন্দ্র, কাত্যায়ন, পাতঞ্জল, বোপদেব, ও দুর্গাসিংহ প্রভৃতি মহামনস্বী পণ্ডিতগণ যে ভাষায় ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে ভাষায় জ্ঞানলাভ পক্ষে, উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতি যথেষ্ট নহে। এতাদৃশ ব্যাকরণ পাঠে সংস্কৃতভাষা-সমুদ্রের পারগামী হওয়ার চেষ্টা ভেলকে সমুদ্র লঙ্ঘনের প্রয়াস তুল্য বিফল। তথাপি মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা চিরঋণী। কেননা তাঁহারই প্রসাদে, বঙ্গদেশে অন্ততঃ স্কুল কলেজে, সংস্কৃত-চর্চ্চা

একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে যাহাতে স্কুল কলেজে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান সহজে ও অল্প সময়ে সম্যক্‌প্রকারে অধীত হইতে পারে, সে বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টিপাত করা উচিত। স্কুল ও কলেজে ছাত্রগণ সংস্কৃতের ঘণ্টাটি যে ভাবে অতিবাহিত করে, তাহা নিতান্ত হাস্যজনক। এ বিষয়, যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন; অতএব অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

যে ভাষার ভাণ্ডারে বেদ শীর্ষ-স্থানে বর্ত্তমান ও ষড়্‌দর্শন, অষ্টোত্তরশতোপনিষদ্‌, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অসংখ্য উপপুরাণ, শ্রৌত-সূত্র, গৃহ্যসূত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, শত শত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার গ্রন্থ, অগম্য ফলিত ও গণিত জ্যোতিষগ্রন্থ, কল্পগ্রন্থ, শিক্ষাগ্রন্থ, নিরুক্তগ্রন্থ, কোষ (অভিধান) গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ঐতিহাসিক মহাকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নৈষধচরিত, শিশুপাল বধ, কিরাতা-র্জ্জুনীয়, মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি অগণনীয় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, সুশ্রুত, চরক, হারীত, বাভট, শালিহোত্র, অশ্ববৈদ্যক, পালকাপ্য প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্র, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বিরচিত অপূর্ব্ব গ্রন্থরাশি, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, উত্তরচরিত, মহাবীরচরিত, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, চণ্ডকৌশিক, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় প্রভৃতি অসংখ্য নাটক, সঙ্গীতশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, চাণক্যনীতি, কামন্দকীনীতি, হিতোপদেশ, কথাসারিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা প্রভৃতি উপদেশ গ্রন্থ এবং কাদম্বরী, হর্ষচরিত, ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি কথাগ্রন্থ, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নানাবিধ স্তূপীকৃত অমূল্য গ্রন্থরাশি যে ভাষা-ভাণ্ডারের ভাস্বর রত্ন, যে ভাষা কদাপি উপেক্ষণীয় নহে।

সংস্কৃতভাষা অধ্যয়নে বৃথা কালক্ষয় করা অপেক্ষা, ইয়ুরোপীয় ভাষায় জ্ঞানলাভে জীবন মন অর্পণ করা যাঁহারা শ্রেয়ঃকল্প মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, পৈত্রিক সম্পত্তি অবহেলায় নষ্ট করিয়া, কেবল পরকীয় ধনে জগতে কেহ কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? যদি তাহা না হয়, তবে জাতীয় অতুল সম্পদ,—রত্নরাজিতে উপেক্ষা দেখাইয়া, কেবল বৈদেশিক ধনে লোভ করিয়া প্রকৃত উন্নতি লাভের আশা দুরাশা মাত্র। পৈত্রিক সম্পদ না হইলেও, যথার্থ জ্ঞান-পিপাসুর নিকট জ্ঞান-সমুদ্রের পীযূষধারা কখনও অবহেলার সামগ্রী নহে। এই হেতুই বিদ্যার্থী বিদেশিগণ, কণ্ঠে ভীষ্মের পিপাসা লইয়া, সংস্কৃত-সাহিত্য-সমুদ্রের সন্নিহিত হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাশি নিহিত না থাকিত, তবে মহাত্মা জোন্স্, কোলব্রুক, কাউয়েল, মনিয়ার উইলিয়মস্, বেবার, বপ, গোলড্ষ্টুকর, মোক্ষমূলর, ডিউসেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ, কখনই অমন কঠোর পরিশ্রম স্বীকারে এই ভাষায় জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতেন না। ফলতঃ এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ এবং বলবতী জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াও বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, ভাণ্ডারকার, টেলাঙ্গ, ভাউদাজী প্রভৃতি দেশীয় সুধীগণ সংস্কৃত ভাষার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত চর্চ্চার যে উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিও আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখা কর্ত্তব্য। বৈদেশিকগণের বাহ্যিক বেশভূষা এবং আহার বিহারের হীন অনুকরণে জাতীয় উৎকর্ষ লাভের কোনই প্রত্যাশা নাই;—উহা

অধঃপাতেরই প্রসর পথ। বৈদেশিকদিগের মধ্যে যদি অনুকরণীয় কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহাদিগের ঐ সাগরশোষিণী জ্ঞান-তৃষ্ণা, অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং কঠোর কর্ম্মানুরাগ।

সংস্কৃত ভাষার অসংখ্য গ্রন্থ ইংরেজী প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং তর্কস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এক ইংরেজী শিখিলেই, যখন সকল তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তখন সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষা শিক্ষার্থ অত শ্রমস্বীকারে প্রয়োজন কি? কিন্তু কেবল অনুবাদ পাঠে মূলের ভাব ও রসাস্বাদন হইতে পারে না। কেন না, অনুবাদ ফটোগ্রাফ্ মাত্র, তাহাতে মূলের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা দুরূহ, অথবা অসম্ভব। কেবল অনুকরণের উপর নির্ভর করিলে অনেক সময় ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিতে পারে, অতএব মূলগ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া, অনুবাদ পাঠ করিলেই সুবিধা হয়।

সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ও সঙ্গীত শাস্ত্রে এবং অপরাপর গ্রন্থে যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব গূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহার উদ্‌ঘাটন এবং বিশ্লেষণ করা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই সমুদয় আমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে আমরা দেখিতে পারি না। যে সমস্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিছুকাল পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বলিয়া উপহাসিত হইয়াছিল, তাহাই আবার অধুনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে,—আজ গঙ্গাজল তুলসীপত্র ও গোময় প্রভৃতি পরম উপকারী বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করিতেছি। কারণ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই

বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্তদ্বারা উপরোক্ত বিষয় সমর্থিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ না বুঝাইয়া দিলে, আমরা কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে চাহি না, ইহা নিতান্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। কেবল গড্ডলিকা প্রবাহে পরিচালিত হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইলে, জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। যাঁহাদের প্রতিভা অমানুষী ছিল, তাঁহাদের বংশধর হইয়া আমরা কেবলই পর-প্রত্যাশী হইব, ইহা বোধ হয়, জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে। ফলতঃ যতই স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই এ ধারণা প্রবল হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে, হিন্দুর পক্ষে ইংরেজী ভাষার অনুশীলন যেমন অবশ্য-কর্ত্তব্য, সংস্কৃতের চর্চ্চাও তদ্রূপ অপরিত্যজ্য।

সম্প্রতি এদেশে অনেকেই গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা আমাদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালার পুষ্টিসাধন ও উৎকর্ষ বিধানে যত্নবান্। লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত বা ইংরেজী ভাষার কোন ধার ধারেন না, তাঁহাদিগের সম্পর্কে বেশী কিছু বক্তব্য নাই। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা রচনা দ্বারা ভাষায় না হইতেছে কোনরূপ শোভার স্ফূর্ত্তি, না ঘটিতেছে কোনরূপ ভাবের পুষ্টি। যাঁহারা ইংরেজীতে সুপ্রবিষ্ট, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা বিষয় সম্পদে ও ভাবগৌরবে সৌভাগ্যবতী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের বাঙ্গালা আদর্শ বাঙ্গালার স্থান অধিকার করিতে পারে না। কারণ, তাঁহাদিগের ভাষায় সকল স্থানে শৃঙ্খলা থাকে না, কারক, সমাস ও তদ্ধিতের প্রয়োগে সময় সময় মারাত্মক দোষ ঘটে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। বাঙ্গালা সমাস, তদ্ধিত ও কৃৎ

প্রভৃতি বহুলাংশে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে অনুশাসিত। বাঙ্গালা ভাষাকে শব্দ-সম্পদ্ ও রীতি-সঙ্গত সৌন্দর্য্য সমুজ্জ্বল করিতে হইলে, বাঙ্গালা লেখকদিগের ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায়ও বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করা কর্ত্তব্য। অপিচ বঙ্গভাষাকে মনোজ্ঞ বেশভূষায় সজ্জিত করিতে হইলে সংস্কৃত ও ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে শোভন রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অলঙ্কৃতা করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই আমাদিগের মাতৃভাষা আশানুরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া ভুবনমোহনবেশে সাহিত্যক্ষেত্রে বিরাজমানা ও সকলের আনন্দ-বিধায়িনী হইতে পারিবে। ফলতঃ সংস্কৃত অনুশীলনকারী পণ্ডিতবর্গ ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত মহাত্মাগণের সমবেত চেষ্টাতে দেশের যে কি মহান্ উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। উপসংহারে অনুরোধ এই যে, উক্ত উভয় শ্রেণীর মহাত্মাগণ, প্রকৃত দেশ-হিতৈষীর প্রাণে এ বিষয়ে মনোযোগ বিধান করুন। ভগবান্ তাঁহাদের সহায় হইবেন, এবং তাহা হইলে, আমরাও একদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিব যে, হিন্দুজাতি পুনর্ব্বার পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সভ্যজগতে বরণীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং শিক্ষাও সর্ব্বথা সার্থক ও সর্ব্বাবয়বে ফলবতী হইয়াছে।

পুষ্পক রথ।

(কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত, কাব্য নাটক এবং কথা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্যোমমার্গে বিচরণের জন্য এক প্রকার অদ্ভুত ব্যোমযান বিদ্যমান ছিল, তাহার নাম "পুষ্পক রথ"। অভিধানে ব্যোমযান ও বিমান একার্থ প্রতিপাদক শব্দ। (ব্যোমযানং বিমানোহস্ত্রী ইত্যমরঃ)। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পুষ্পক রথ কি কবি কল্পনা মাত্র? অথবা প্রকৃতই কোনও বাস্তব পদার্থ। কোনও পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার কল্পনা সম্ভবপর হইতে পারে না। কবি কল্পনা বস্তুর অতিরঞ্জন অথবা বিকৃত বর্ণনা করিতে পারে, কিন্তু যাহা নাই, তাহার কল্পনা করিতে পারে না। সত্য বটে, কবি কল্পনা বলে "Gives to airy nothing a local habitation and a name". সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখিত ব্যোমযান কি airy nothing মাত্র? এই কথার মীমাংসা করিতে হইলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়।

জগতের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায় যে, সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষে আকাশ পথে ভ্রমণের জন্য গগনচারী বিমানের অস্তিত্ব ছিল। ইতঃপর কবিগুরু বাল্মীকির

রামায়ণ পাঠে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, রামায়ণ রচনার কালেও (ত্রেতাযুগে) ব্যোমযান বিদ্যমান ছিল। ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি দশানন বধের পর সীতাদেবীকে উদ্ধার করতঃ রাবণের অধিকৃত পুষ্পক রথ লাভ করেন, এবং সীতাদেবীকে তৎসাহায্যেই আকাশ পথে অযোধ্যা নগরীতে আনয়ন করেন। এই পুষ্পক রথটী রাবণ কুবের হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা এই বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারি যে, শ্রীরামচন্দ্রের কোনও প্রকার ব্যোমযান ছিল না, তাঁহাকে প্রথমতঃ সমুদ্র লঙ্ঘন জন্য সেতু প্রস্তুত করাইতে হইয়াছিল। ব্যোমযান থাকিলে শ্রীরামচন্দ্র সেতু বন্ধন জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেন না। তবে তাঁহার সৈন্যসামন্তকে সমুদ্র লঙ্ঘন করাইবার জন্য অবশ্য সেতু বন্ধনের প্রয়োজন ছিল। পুষ্পক রথ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল না বলিয়াই অনুমান হয়, কারণ এতাদৃশ বিমান প্রস্তুত ব্যাপার বোধ হয় বহু আয়াস ও ব্যয়-সাধ্য ছিল এবং সকলে বোধ হয় নির্ম্মাণ কৌশলও অবগত ছিল না। যদি পুষ্পক রথকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে প্রশ্ন হয় যে—এই অদ্ভুত বিমান কি উপকরণে নির্ম্মিত হইত এবং তাহা কি কৌশলে গগন পথে অনায়াসে পরিচালিত হইত? এসমস্ত বিষয় জানিবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না? পরিতাপের বিষয় আমরা এপর্য্যন্ত এপ্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য কোনও অকাট্য প্রমাণ পাই নাই। শিল্প শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার অধিকাংশই বর্ত্তমান কালে দুষ্প্রাপ্য অথবা বিলুপ্ত। ভারতের অনেক গ্রন্থালয়ে এখনও অনেক হস্তলিখিত নানাপ্রকার গ্রন্থ কীট-দষ্টাবস্থায় উপেক্ষিত হইতেছে, সে গুলির উদ্ধার সাধন করিতে

পারিলে হয়ত অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নেরই সমাধান হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কিনা সন্দেহ। শিল্পসংহিতা নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু অদ্যাপি এই গ্রন্থখানা আমাদের নয়নপথবর্ত্তী হয় নাই। বাৎস্যায়ন ঋষি প্রণীত সুবিখ্যাত কামসূত্র গ্রন্থ পাঠে চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যার বিবরণ অবগত হওয়া যায়। "যন্ত্রমাতৃকা" উক্ত চতুঃষষ্টি বিদ্যার অন্যতম। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর জয়মঙ্গল টীকায় যন্ত্রমাতৃকা কলার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশ" গ্রন্থে যন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত—সজীব ও নির্জীব। গো, অশ্ব প্রভৃতি চালিত যান নির্জীব এবং জল, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি চালিত যান সজীব। পুষ্পক রথ, ব্যোমযান, রণতরী প্রভৃতি নির্জীব যান। "বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশে" এই সমস্ত যান প্রস্তুতের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশ অদ্যাপি দুর্লভ। অত্রাবস্থায় আমাদিগের রামায়ণ, মহাভারত ও কাব্য পুরাণাদি পাঠেই পুষ্পকরথের বিষয় অবগত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যে ভারত এক সময় নানাবিধ বিদ্যার আলোচনায় জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার আজ অতি শোচনীয় অবস্থা কেন হইল, ইহা বুঝিতে হইলে, ভারতের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন; সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ আলোচনা ব্যতীত এই জ্ঞানলাভের অন্য প্রকৃষ্ট উপায় নাই। প্রকৃত বটে যে কেবল মাত্র অতীতের গৌরব গাহিয়া বৃথা আস্ফালন ও অহঙ্কার প্রকাশ করিলেই জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে:—Nation which cannot look backward can't go forward. একথা

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বথা প্রযুজ্য; কারণ আমাদের যদি কিছু স্পর্দ্ধা ও গৌরবের দ্র া থাকিয়া থাকে, তবে তাহা সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে রক্ষিত অমূল্য রত্নরাজি। বর্ত্তমান সভ্য জগৎ এই সমস্ত রত্ন আহরণের জন্য একান্ত ব্যগ্র; কিন্তু আমরা তাহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়াও তৎসমূহ রক্ষা করা সঙ্গত মনে করিতেছি না, ইহা আমাদের দশাবিপর্য্যয়েরই পরিচায়ক। প্রসঙ্গাধীন আমরা আলোচ্য বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রয়াস করা যাউক।

পুষ্পক রথ সম্বন্ধে রামায়ণের বর্ণনা এতই স্পষ্ট ও সর্ব্বজনবিদিত যে তৎসম্বন্ধে আর বিশেষ বাগ্‌জাল বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। রামায়ণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পক সাহায্যেই লঙ্কা হইতে আকাশ-পথে সীতা দেবীকে সহ অযোধ্যায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে ব্যোমযান কবিকল্পনা প্রসূত খপুষ্প নহে, অপরন্তু ইহা বাস্তব। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কবি কিছু অতিরঞ্জন করিয়াছেন, তথাপি এ সম্বন্ধে মূলে একটা সত্য নিহিত আছে।

মহাভারতের বনপর্ব্বে শল্যের আকাশপথে সৌভপুরীর বর্ণনা ও আকাশপথে বিচরণ এবং যুদ্ধ বর্ণনা বিস্ময়জনক। রামায়ণ বর্ণিত মেঘান্তরালাবস্থিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ বর্ণনাও অদ্ভুত। এ সকল কল্পনা মাত্র কিনা তাহা বলা দুরূহ, তবে আকাশপথে বিচরণ সম্ভবপর হইলে, বিমানাবস্থিত অবস্থায় যুদ্ধাদিও অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান কালে উদ্‌ভাবিত ব্যোমযান সহায়তায় পাশ্চাত্যজাতিগণও আকাশপথে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। Airship এবং æroplane প্রভৃতি যে

প্রকার দ্রুতগতিতে উন্নত হইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে, অচির-কাল মধ্যেই গগনমার্গে বিচরণ অতি অনায়াস সাধ্য হইবে। পুষ্পক রথের বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে তাহা বর্ত্তমান airship প্রভৃতি হইতে উন্নত ছিল, কারণ তাহাতে বহু লোক যুগপৎ আরোহণ করিতে পারিত এবং পুষ্পক অতি সহজেই যথেচ্ছা চালিত হইত। অনেক স্থলে বিমানচারী রথগুলিতে অশ্ব ও হংসাদি যুক্ত বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়, ইহা বোধ হয় রূপক মাত্র, অথবা ইহাও বিচিত্র নহে যে বিমানে অশ্ব অথবা হংসাদির পুত্তলিকা কৌশলে সংযুক্ত হইত এবং সেগুলি রথের শোভাবর্দ্ধন করিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান airship প্রভৃতিকেও এই প্রকার সৌন্দর্য্য ভূষিত করা হইবে। ইতঃপর আমরা ভারতীর বরপুত্র কবিকুল শিরোমণি বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি মহাকবি কালিদাসের মহাকাব্য রঘুবংশ হইতে ব্যোমযানের বর্ণনা সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করিব। রঘুবংশের ১৩শ সর্গে মহাকবি সমুদ্র বর্ণন ব্যাপদেশে যে অদ্ভুত কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। দশানন বধের পর সীতা দেবীকে পুষ্পক রথের সাহায্যে আকাশপথে অযোধ্যা আনয়ন প্রসঙ্গে যে বর্ণনা রঘুবংশের ১৩শ সর্গে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেও তৃপ্তি বোধ হয় না; যে কোনও দেশের যে কোনও সুধীই এই বর্ণনা মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তিনিই আত্মহারা ও মুগ্ধ হইবেন এবং মহাকবির পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইবেন। মহাকবির অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষার পরিচয় গ্রহণ করিতে হইলে রঘুবংশের

১৩শ সর্গ আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হয়। অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা সমগ্র সর্গটী উদ্ধৃত করিলাম না, কেবল মাত্র যে যে স্থলে ব্যোমযান সম্বন্ধে বর্ণনা আছে সেই কতিপয় শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। ১৩শ সর্গের আরম্ভেই মহাকবি বলিতেছেন :—

অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ
পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং
রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ ॥

অনন্তর (রাবণ বধান্তর সীতা উদ্ধারের পর) গুণগ্রাহী (রত্নাকরাদি গুণাভিজ্ঞ) রাম নামক হরি রথারোহণে (পুষ্পক রথারোহণে) স্বীয় স্থান (বিষদ্ বিষ্ণুপদমিব) শব্দগুণ (আকাশের শব্দগুণ) আকাশে আরোহণ করে। রত্নাকর সমুদ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া নির্জনে সীতা দেবীকে বলিতে লাগিলেন।

অতঃপর মহাকবি সেতুবন্ধনযুক্ত সমুদ্র ও তারকামণ্ডিত ছায়াপথ দ্বারা বিভক্ত নীল আকাশের যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা রমণীয় ও অনুপম। বিমানের গতি বর্ণনা উপলক্ষে মহাকবি বলিতেছেন :—

ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং
ক্বচিদ্ ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ
প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্ ॥

সীতা দেবীকে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—এই দেখ আমাদের

বিমান কখনও দেবতার পথে, কখনও মেঘের পথে, কখনও বা বিহগের পথ অবলম্বনে আমার ইচ্ছানুসারে গমন করিতেছে।"

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্যোমযান আরোহীর ইচ্ছানুসারেই চালিত হইত। পুষ্পক রথের গতি কত দ্রুত তাহা মহাকবি অতি কৌশলে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। লঙ্কা হইতে অযোধ্যাপুরী পর্য্যন্ত উত্তীর্য্যমান দীর্ঘ পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অতিক্রান্ত হইত। এতদুপলক্ষে কত নগর, কানন, শৈল, নদী প্রভৃতির মনোহর বর্ণনা উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহা রঘুবংশের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বিমানরাজ প্রয়াগের উপরিদেশে উপনীত হইলে, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম দর্শনে শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত ভাবে সীতা দেবীকে যে ভাবে তাহা দেখাইতেছেন, মহাকবি কি সুন্দর উপমা রাজি দ্বারা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন! অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেই বর্ণনা উদ্ধৃত হইল না।

রামানুজ ভরত অগ্রজকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন করিলে বিমানরাজ ধীরে ধীরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইল, অতঃপর ভরত ও শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি সকলে মিলিত হইলেন, কিছুকাল পর পুষ্পক পুনর্ব্বার আকাশ পথে উত্থিত হইতে আরম্ভ করিল। এ সময়ে রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত—ভ্রাতৃত্রয়ই সীতা দেবী সহ রথারূঢ়। মহাকবি এতদুপলক্ষে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন :—

ভূয়স্ততো রঘুপতিবিলসৎ পতাকং
অধ্যাস্ত কামগতিং সাবরজো বিমানম্।
দোষাতনং বুধ বৃহস্পতি যোগ দৃশ্য
স্তারাপতি স্তরল বিদ্যুৎ দিবাভ্রবৃন্দম্॥

অনন্তর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র কনিষ্ঠদ্বয়ের সহিত বাতান্দোলিত সুশোভন পতাকাযুক্ত কামগতি বিমানে আরোহণ করিলেন ; তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন বুধ, বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়সহ রমণীয় চন্দ্রমা প্রদোষ কালীন চঞ্চল মেঘখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এই বর্ণনার তুলনা জগতের সাহিত্যে দুর্লভ। এই সমস্ত বর্ণনা পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে মহাকবি প্রত্যক্ষ করিয়াই সমস্ত বিষয় যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সময় ব্যোমযান বিদ্যমান ছিল কি না, তাহা নির্ব্বিবাদে প্রমাণিত হয় না। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের বর্ণনা অবলম্বনেই স্বীয় অমানুষী প্রতিভা বলে পুষ্পক রথের বিস্ময় জনক বর্ণনা করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে মহাকবি কালিদাস আকাশ হইতে রথের অবতরণ প্রসঙ্গে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন :—

“মাতলী বলিতেছেন—

অথ কিম্! খণাচ্চায়ুষ্মান্ স্বাধিকারভূমৌ বর্ত্তিষ্যতে।

আর কি! আয়ুষ্মন্, আপনি অনতিবিলম্বেই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইবেন।

রাজা—(অধোঽবলোক্য)--মাতলে! বেগাদবতরণাদাশ্চর্য্য-দর্শনং সংলক্ষ্যতে মনুষ্যলোকঃ তথাহি —

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জ্যতং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহাতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্ধানং তনুভাগনষ্টসলিল ব্যক্তা ব্রজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥

রাজা দুষ্মন্ত অধোভাগে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিতেছেন:—মাতলে! বেগে অবতারণ বশতঃ মনুষ্যলোক (পৃথিবী) কি আশ্চর্য্য দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ—উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে ভূপ্রদেশ যেন ভূপ্রদেশে অবতীর্ণ হইতেছে, বৃক্ষ সমূহের মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হওয়াতে তাহারা যেন আর পত্রাভ্যন্তরলীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। পূর্ব্বে বহু উচ্চ হইতে তাহা এই প্রকারই অনুমিত হইতেছিল। নদী সকল ক্ষীণ ভাবে প্রায় অদৃশ্যই ছিল, এক্ষণে ক্রমে প্রকাশিত হওয়াতে তাহারা যেন সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে। আমার মনে হইতেছে কোনও মহাপুরুষ যেন বিপুলা পৃথিবীকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করতঃ আমার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিতেছে।

অন্যান্য কাব্য নাটক পুরাণ প্রভৃতি হইতে ব্যোমযান সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত হর্ষচরিত নামক কথা-গ্রন্থের ষষ্ঠোচ্ছ্বাসে ব্যোমযান প্রস্তুত সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তার রূপ এই—

"আশ্চর্য্য কুতূহলী চণ্ডীপতি দণ্ডোপনত যবন নির্মিতেন
নভস্তলচারিণা যন্ত্রযানে নায়ীত ক্বাপি।"

কুতূহলী চণ্ডীপতি দণ্ডোপনীত যবন নির্ম্মিত আকাশগামী যানে আরোহণ করা মাত্র যন্ত্র বলে চালিত করিয়া তাহাকে কোন অপরিচিত দেশে বহন করিয়া নিল!

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আকাশগামী বিমান প্রকৃত প্রস্তাবেই একটা কিছু ছিল। অপিচ—পুষ্পক সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃই উক্ত হইয়াছে যে তাহা মায়া (কৌশল) বিশেষে নির্ম্মিত।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মহাত্মাগণ কেবল মাত্র কাব্য নাটোকোক্ত বর্ণনা দ্বারা ব্যোমযানের অস্তিত্ব বিষয় নিঃসন্দিহান হইতে পারেন না, একথা যথার্থ, কিন্তু শিল্প শাস্ত্র সংক্রান্তগ্রন্থ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগকে এই সমস্ত বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই তৃপ্ত হইতে হইবে। আমাদের মনে হয়, ব্যোমযান কবিকল্পিত নহে, ইহা বাস্তবিকই প্রাচীন ভারতে বিদ্যমান ছিল। কালের ভীষণ আবর্ত্তনে ভারতের অনেক দ্রব্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে না, তাহাই যে কবিকল্পিত একথা বলা সমীচীন নহে। আয়ুর্ব্বেদের শল্য তন্ত্রোক্ত অনেক অস্ত্রশস্ত্রাদি ভারতের প্রায় কুত্রাপি দেখা যায় না, অত্রাবস্থায় এগুলি কল্পনা মাত্র বলা সঙ্গত হইবে কি? ধনুর্ব্বেদোক্ত অনেক যুদ্ধোপকরণ এবং অস্ত্র শস্ত্রও বিদ্যমান নাই, সেগুলিকেও কি কাল্পনিক বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে?

পাশ্চাত্য তত্ত্বানুসন্ধায়ী বুধবৃন্দ অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাবলী অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতঃ বহু অভিনব তত্ত্বাবিষ্কার করিতেছেন, আর আমরা সেগুলির প্রতি যথেষ্ট অনাদর ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি, ইহা আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—হিন্দু সন্তানগণ যেন তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি হেলায় না হারান। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, সে গুলির যথেষ্ট আলোচনা হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সত্য কথা বলিতে কি—পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের যুগপৎ আলোচনা

হিন্দু সন্তানের পক্ষে যত সহজসাধ্য, জগতের অন্য কোনও জাতির পক্ষে তাহা নহে। আমাদের মনে হয়, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনা দ্বারাই মানবের চরম উন্নতি সাধিত হইবে,—এতদুদ্দেশ্যেই বোধ হয় পরমকারুণিক সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রাচীন ভারতকে পরম বিদ্যোৎসাহী জড়বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নত ইংরেজ জাতির শাসনাধীন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সুযোগ অনবধানে হারাইলে আমাদিগকে পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হইতে হইবে। আশা হয়, অচিরাৎ হিন্দু জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করতঃ মানবীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সক্ষম হইবে।

(সৌরভ) ।

অভিভাষণ।

(১৩২০ সালের ২৮ ফাল্গুন কলিকাতা কালিঘাটে আহুত ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের সভাপতিরূপে মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক পঠিত)

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
বেদাধীনা জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণা দেবতাঃ॥

অদ্য যে মহদুদ্দেশ্যে আমরা পূতসলিলা জাহ্নবী-তটস্থিত মহাপীঠ ৺কালীঘাটে সমবেত হইয়াছি, তাহা বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিবস বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। ৺কালীঘাট ভারত-বিখ্যাত মহাতীর্থ; ইহার পবিত্র রজঃস্পর্শে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন পবিত্র হইলেন। ব্রহ্মণ্য দেব ইহার উপর অমোঘ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

আমি ব্রাহ্মণসন্তান . এবং "ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ" এই আশ্বাস বাণীর উপর নির্ভর করিয়াই, নিতান্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও মহা-সম্মিলনের সভাপতিত্ব ভার গ্রহণে সম্মত হইয়াছি। সমবেত ভূদেব ব্রাহ্মণবর্গকে সবিনয় নমস্কার জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমি বিষম দায়িত্বপূর্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলাম; আমার ধৃষ্টতা আপনারা নিজ-

গুণে মার্জ্জনা করিবেন। ব্রহ্মণ্য দেবের আশীর্ব্বাদে এবং আপনাদের সহায়তায় ও ৺ মহামায়ার কৃপায় বৃত কার্য্য সুসপন্ন করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইব।

অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখিতে পাই যে, এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে যখনই কোনও জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা বা নির্দ্ধারণ প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই উদারহৃদয়, লোক-হিতৈষণা-প্রণোদিত, পরম কারুণিক ঋষি সম্প্রদায়, জনকোলাহল ও অশান্তি-পূর্ণ লোকালয় হইতে সুদূরস্থিত শান্তরসাস্পদ, পবিত্র নৈমিষারণ্য প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে সমবেত হইয়া অতি ধীরভাবে ও সমাহিত চিত্তে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। ইহাই ভারতীয় সমাজের চিরক্রমাগত প্রথা। অদ্যকার এই সম্মিলনও সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই, নৈমিষারণ্য প্রভৃতির ন্যায় নির্জ্জন স্থানে না হউক, অন্ততঃ অতি পবিত্র পীঠস্থানে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছেন; ভরসা করি, তাঁহারাও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের ন্যায় সংযত ভাবে, কোন সম্প্রদায় বা জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিন্দুমাত্রও কটাক্ষপাত বা অপ্রিয় বচন পরম্পরা প্রয়োগ না করিয়া, আলোচ্য বিষয়গুলির যথাযথ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করতঃ ব্রাহ্মণত্বের গৌরব রক্ষা করিবেন। তাহা হইলেই এই মহাসম্মিলনের সদভিপ্রায়সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইবে। নতুবা ইহা নিরর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। নানাবিধ প্রতিকূল কারণে এবং কালচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে ভারতীয় অতি প্রাচীন ও পবিত্র হিন্দু সমাজ কিছু বিপর্য্যস্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে; অত্রাবস্থায় সমাজকে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সুপথে

পরিচালিত করিতে না পারিলে ইহা বিপদসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ সংকীর্ণ বর্ম্মে প্রধাবিত হইয়া ঘোর বিপন্ন হইবে; হইবেই বা বলি কেন? প্রকৃত প্রস্তাবে হইতেছেও তাহাই। এই ভাবে সমাজ চলিতে আরম্ভ করিলে ইহা অচিরাৎ বিলয়দশা প্রাপ্ত হইবে, এবং হিন্দুনামও চিরতরে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে। হিন্দু সমাজের উপর দিয়া বহু প্রবল ঝঞ্ঝাবাত এবং ভীষণ বন্যার স্রোত চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা এ পর্য্যন্তও একেবারে অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হয় নাই; নানা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও হিন্দুজাতি সম্যক্ প্রকারে না হউক, কথঞ্চিৎ প্রকারেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কোন্ মহাশক্তি প্রভাবে এবং কি সুদৃঢ় অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াতে হিন্দু সমাজ আজও একেবারে বিলয়দশা প্রাপ্ত হয় নাই, এবং হিন্দু জাতির প্রকৃত মেরুদণ্ড কোন্‌টী, তাহা চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই অভিনিবেশ সহকারে চিন্তনীয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় **ধর্ম্ম** ও **সমাজশক্তিই** হিন্দু সমাজের প্রাণ এবং **বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই** ইহার মেরুদণ্ড। **বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম** ও **সমাজ শক্তি** এবং **ভগবানে ভক্তি বিশ্বাস**, অক্ষুণ্ণ থাকিলে কিছুতেই হিন্দু সমাজ নষ্ট হইতে পারিবে না; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা বর্ত্তমানকালে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ও আত্মহারা হইয়াছি, তাহাতেই আমাদের নানা দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রম রক্ষার ভার রাজার বা রাজশক্তির উপর ন্যস্ত ছিল এবং ব্রাহ্মণ তাহার নিয়ামক, চালক

ও উপদেষ্টা ছিলেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন "রাজ্ঞশ্চ বর্ণাশ্রমপালনং যৎ। স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ॥" বর্ত্তমান কালে আমরা যে রাজার শাসনাধীনে আছি, তিনি বৈদেশিক হইলেও আমাদের ধর্ম্ম বা সমাজের উপর কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না; ইহা রাজপুরুষদের সূক্ষ্মদর্শিতা ও সমীচীনতারই পরিচায়ক। অতএব সমাজ-শক্তির অপব্যবহার হইয়া থাকিলে বা ধর্ম্মকার্য্যে অবহেলা সমাজে প্রাবল্য লাভ করিয়া থাকিলে আমরাই তজ্জন্য দায়ী। ব্রাহ্মণ ভারতীয় হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয়। "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" ইহা ভারতের চিরপ্রচলিত বাক্য। সেই ব্রাহ্মণ যদি বিপথগামী বা আত্মহারা এবং আচার ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তবে সমগ্র সমাজ তৎপথবর্ত্তী হইবেই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ইতর ব্যক্তি তদনুসরণই করিয়া থাকে এবং তিনি যাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করেন, লোক তাঁহারই অনুকরণ করে।

"ব্রাহ্মণ" সমাজের উত্তমাঙ্গস্বরূপ, উত্তমাঙ্গ বিকৃত হইলে মানব দেহ যেমন বিকার প্রাপ্ত হয়, সমাজ দেহের উত্তমাঙ্গ অপ্রকৃতিস্থ হইলেও সমগ্র সমাজই তদ্রূপ বিপর্য্যস্ত হয়; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে উত্তমাঙ্গ প্রকৃতিস্থ এবং সুস্থ রাখা কর্ত্তব্য। অতীতকালে ব্রাহ্মণ যে গুণে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, সেই গুণ হইতে

চ্যুত হইলে তিনি আর সম্মানার্হ বা গৌরবান্বিত হইবার আশা করিতে পারেন না। জন্মগত ব্রাহ্মণ্য ও গুণগত ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণ মুখ্য ও গৌণ এই দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারেন। এই মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে "তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ব্রাহ্মণকারণম্" ; যাঁহার কেবলমাত্র জন্মগত ও সংস্কারগত ব্রাহ্মণ্য আছে তাঁহাকেই গৌণ ব্রাহ্মণ বলা যায়। জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব, জাত কর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কার দ্বারা পরিস্ফুট ও নির্ম্মল হয়। যাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংস্কারহীন ও আচারভ্রষ্ট হইলে সমাজে মুখ্য ব্রাহ্মণত্বের সম্মান লাভের অধিকারী হইতে পারেন না, ইহা অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নহে। শাস্ত্রে কথিত আছে —

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ।
যদ্যপ্যধীতং সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ॥"

ভগবান্ মনু বলিতেছেন :—

"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ॥"

সদাচারবিহীন হইলে ষড়ঙ্গবেদ পাঠদ্বারাও ব্রাহ্মণগণ পবিত্র হইতে পারেন না ; অতএব সদাচার অবশ্য পালনীয়। চিত্তশুদ্ধি সদাচারের উপরই নির্ভর করে এবং সদাচার ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রভৃতি বিচারসাপেক্ষ।

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতো প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোঽহন্ত্যলক্ষণম্ ॥
অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রাঞ্জিঘাংসতি ॥
আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবিদ্ দ্বিজঃ ॥"
(মনু)

শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে:—

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ॥"

প্রসঙ্গাধীন এখানে বক্তব্য এই যে, অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশেরই ধারণা এই যে, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই মত কতটা বিচারসহ তাহা চিন্তনীয়। অন্নের বিকারই প্রাণ, প্রাণের সূক্ষ্মাবস্থা মন, মনের সূক্ষ্মাবস্থা আত্মা; অতএব চিত্তশুদ্ধি যে আহার শুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তৎপক্ষে তর্কদ্বারা মীমাংসায় উপনীত হওয়া একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি না হইলে মানুষের ধর্ম্মভাব উন্মেষিত হইতে পারে না, অতএব আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ আছে কি? এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা আহার করিবার জন্য জীবন ধারণ করি না, পরন্তু জীবন ধারণ করার জন্যই আহার করি। যে

আহারে পাশবিক প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়, তাহা মানুষের পক্ষে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। আহার বিহারের সংযম না থাকিলে কখনও মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না; প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে কখনও মনুষ্য, জীবনে সুখী হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"ওজস্করং শরীরস্য চেতসঃ পরিতোষদং।
ধর্ম্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যং বিদুর্ব্বুধাঃ॥
শরীরং চীয়তে যেন ক্ষীয়তে রোগসন্ততিঃ।
সন্মতি র্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
ইহামুত্র সুখং যস্মাৎ তদেবার্চ্চ্যং প্রযত্নতঃ।
আয়ুষ্কামেন হাতব্যং তদন্যদ্ গরলং যথা॥"

যে আহার্য্য দ্রব্য দেহের শান্তিজনক, চিত্তের প্রফুল্লতাকারক ও ধর্ম্মভাবোদ্দীপক তাহাকেই পণ্ডিতগণ সুপথ্য বলিয়া থাকেন। যাহা দ্বারা ইহকালে সুখ এবং পরলোকে শান্তি লাভ করা যায়, তাহাকে সুপথ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি অন্যপ্রকার আহার বিষবৎ ত্যাগ করিবেন। আহার্য্য দ্রব্য সত্ব, রজঃ ও তমো গুণ ভেদে তিনভোগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গীতায় কথিত হইয়াছে :—

"আয়ুঃসত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥

কট্‌ব্লম্লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং চ ॥”

আহার ভেদে মানুষের সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ সম্বন্ধে তারতম্য হইয়া থাকে। ইতর প্রাণিগণও প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীনে আহার সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকে। “মানুষের পক্ষে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের প্রয়োজন নাই”,--একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীর রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার হইতে পারে না, অতএব ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার সম্বন্ধে ঋষিদের যোগজ্ঞান লব্ধ, শাস্ত্রানুমোদিত মতই গ্রাহ্য হওয়া সমীচীন। সাময়িক পরিবর্ত্তনানুসারে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয় করিতে হইলে গীতোক্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উদ্ধৃত শ্লোকগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা করাই শ্রেয়ঃ। বর্ত্তমানকালে অন্নবিচার প্রায় রহিত হওয়ার উপক্রম দেখা যাইতেছে, ইহার ফল যে শুভ হইবে তাহা আমার মনে হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে ও কালধর্ম্মে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের শিথিলতা হইলেও এ বিষয়ে সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন বিধেয়। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক ;—

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

“চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥”

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ আমি ইহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানিও। ব্রাহ্মণাদি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) চতুর্ব্বর্ণ সত্ত্ব, সত্ত্বরজঃ, রজস্তমঃ ও তমোগুণের প্রাধান্যজাত। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রকৃতির গুণ হইতেই কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতেই জাতি বা বর্ণ নির্ণীত হয়। এই গুণ ও কর্ম্ম স্বাভাবিক, মানুষের ইহাতে স্বাধীনতা নাই। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" (সাংখ্যমত)। এই প্রকৃতির প্রেরণাতেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। কর্ম্মকে শাস্ত্রে "স্বভাবজ" বলা হইয়াছে, তদ্ যথা :—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥
কৃষি গো-রক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

উপরোক্ত শ্লোকগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে, জাতি বা বর্ণভেদ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জগতের সমগ্র মানব সমাজেই কোন না কোন প্রকার জাতি বা শ্রেণী ভেদ আছেই। ভারতের বর্ণ বা জাতি ভেদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ইচ্ছা করিলেই কেহ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইতে পারে না। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে, জন্মজন্মান্তরে জাত্যন্তর সংঘটিত হইতে পারে। হিন্দু জন্মান্তরবাদী, অতএব তিনি যে কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে দুঃখিত হইতে পারেন না। আমাদের বর্ত্তমান পূর্ব্ব জীবন পূর্ব্ব-জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের সমষ্টি মাত্র, অতএব জন্মান্তরীণ সুকৃতি দুস্কৃতিই আমাদের ইহজীবনের সুখ দুঃখের কারণ বা নিয়ামক। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত অনেক মহাত্মারই ধারণা এই যে, জাতি বা বর্ণভেদই, ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ অনিষ্টের মূলীভূত কারণ এবং তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম ও আচারনিষ্ঠতার শত বন্ধনেই সমাজ বিকল ও মৃতকল্প হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সম্মিলন তাঁহাদের এই মতবাদের সমালোচনা করিবেন এইরূপ আশা করিতে পারি। আমার বিশ্বাস বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই হিন্দু সমাজ শত বিপ্লবের ভীষণ তাড়নাতেও অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। অন্য কোন দুর্ব্বল ভিত্তির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেই আর ভারতীয় সমাজ থাকিবে না। যে কোন জাতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলেই তত্তজ্জাতি বিলুপ্ত হইবেই। যাঁহারা সমাজের প্রকৃত কল্যাণকামী, তাঁহারা যেন হিন্দু জাতীর জাতীয়ত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা না করেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কাল, দেশ, পাত্রা-নুসারে সেগুলি যতদূর পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্জ্জিত হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা সমীচীন, ব্রাহ্মণ সমাজ এ বিষয়ে যথাশক্তি চিন্তা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। যুগভেদে ব্যবহারিক ধর্ম্মভেদ ঋষিগণের অনভিপ্রেত নহে। "কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং শঙ্খলিখিতো"-ইত্যাদি ঋষিদেরই মত। "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ" এ কথা পণ্ডিত-

গণের সুবিদিত। মনু বলিতেছেন—"অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে। অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥" কাল, দেশ, পাত্রানুসারে বিধি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনীয় বা পরিবর্জ্জনীয়। শাস্ত্র চিরকালই এই নিয়মের বশবর্ত্তী ছিলেন; "দেবরেণ সুতোৎপত্তি-র্মধুপর্কে পশোর্বধঃ। দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্য চ" প্রভৃতি বচনেই ইহার প্রমাণ। সামাজিক বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন চিরকালই বুধমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষ বিবেচনা সহ সাধিত হইয়াছে। সামাজিক রীতি নীতি ও বিধি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে বিশেষ ধীরতা ভবিষ্যদ্দর্শিতা ও সমীচীনতা সহকারে করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রাচীন ঋষিগণের স্থানে বর্ত্তমান কালে অধ্যাপক ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাঁহারা অপক্ষপাত-বিচার সহ শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তির আশ্রয়ে সর্ব্ববিধ সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিলে সমাজ সু-প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"

যে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করতঃ যথেচ্ছাচারী হইবে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। এই মহতী বাণীই সমাজ রক্ষার মূল মন্ত্র হওয়া উচিত।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যানুসারেই মানুষের বর্ণভেদ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে :—

"ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বর্ণ যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণ। এই নিয়ম অব্যভিচারী নহে। ইহা প্রায়িক মাত্র। কারণ প্রাচীন ভারতে মহর্ষি ব্যাসদেব ব্রাহ্মণ হইয়াও কৃষ্ণবর্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় হইয়াও শ্যামবর্ণ এবং বলদেব ক্ষত্রিয় হইয়াও শ্বেতবর্ণ ছিলেন। ঋগ্‌বেদে উক্ত হইয়াছে :—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসাৎ বাহু রাজন্য কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥"

বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরুদেশ বৈশ্য এবং পাদদেশ শূদ্র হইল। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী অনেক ভারতীয় সুধীগণ বেদের এই উক্তিটী প্রাচীন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা এই সূত্রটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন; আমি এবিষয়ে কোনও বিচার করিতে ইচ্ছা করিনা। বেদপন্থীদের মতে জাতি ও বর্ণ বিভাগ অনাদি কাল হইতেই বর্ত্তমান, ইহা মনুষ্যকল্পিত নহে, ইহা প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়ম বশেই হইয়াছে; এ বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের ১০ম সর্গে বলিতেছেন :—

"চতুর্ব্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যু গাঃ।
চতুর্ব্বর্ণময়ো লোকস্তত্ত্বং সর্ব্বং চতুর্মুখাৎ ॥"

প্রকৃতির প্রেরণাতেই যে জাতি ও বর্ণ বিভাগ হইয়াছে ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান কালে আমাদের মধ্যে প্রকৃত মুখ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির একান্ত অসদ্‌ভাব ঘটিয়াছে, আমাদের আধিকাংশই এখন "ক্রুবাণ ব্রাহ্মণ" মাত্র। এরূপ হওয়ার বহুবিধ কারণ বিদ্যমান; সে সমস্তের প্রতীকার কতকগুলি আমাদের সাধ্যায়ত্ত এবং কতকগুলি নহে। ব্রাহ্মণসম্মিলন যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তবেই উদ্দেশ্য সফল হইবে, নতুবা ইহা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, তদ্‌ যথা,—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

এই দশবিধ ব্রাহ্মণের অবান্তর ভেদ এই প্রকার কথিত হইয়াছে:—

"সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনং।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ১
বৈশ্বদেবঞ্চেত্যনন্তরং কুর্ব্বন্নিতি পূরণীয়ম্।
শাকে পাত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ
নিযতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥২
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥৩
অস্ত্রহতাশ্চ বল্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
প্রারম্ভে নির্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥৪

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥৫
লাক্ষালবণসম্মিশ্র কুসুম্ভক্ষীরসর্পীষাং।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে ॥৬
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥৭
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥৮
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥৯
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে ॥১০”

বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন্‌টীর অন্তর্গত, একটু চিন্তা করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এসম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে গুণ ও কর্ম্মবশে ব্রাহ্মণ প্রাচীন ভারতের সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন ছিলেন তাহা অনন্যসাধারণ। আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমির একচ্ছত্রী সম্রাটের বহুমূল্য রত্নরাজিখচিত মুকুটযুক্ত মস্তক যে ব্রাহ্মণের পদতলে স্বতঃই অবনত হইত, সে ব্রাহ্মণ কখনও দুগ্ধফেণনিভ শয্যাশায়ী, অভ্রংলিহ প্রাসাদবাসী ধনকুবের ছিলেন না। তিনি

বাছিয়া বাছিয়া এমন একটী বৃত্তি জীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহার তুল্য হীন ও দুঃখের বৃত্তি আর হইতেই পারে না, সেটী কি ? না "ভিক্ষা"। সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ কামনাতেই ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্যাগী, পর্ণকুটীরবাসী এবং শাকান্নভোজী হইয়াছিলেন। তাঁহারা ধনবান্, বা অস্ত্রবান্ ছিলেন না ; অথচ তিনি এমন একটী ধনে ধনী ছিলেন যাহা "জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।" জ্ঞানবল তাঁহার প্রধান বল ও অস্ত্র ছিল এবং সংযম ও ত্যাগই তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ প্রতিপাদক ছিল। ব্রাহ্মণই ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের রক্ষক ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ ধনলুব্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অর্থকে পরমার্থের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার অধঃপাতের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম, নির্লোভ, নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু না হইতে পারেন, তবে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব অটল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণোচিত বাহ্যাভ্যন্তরশুচিতা না থাকিলে তিনি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতৃপুরুষের বহু আয়াসলভ্য অতুল সম্পত্তি হারাইয়া বাস্তবিকই আজ অতি দরিদ্র হইয়াছেন ও হইতেছেন। আর্থিক দারিদ্র্য তাঁহার চিরকালই ছিল ; কিন্তু প্রকৃত ধন হারাইয়া তিনি আজ পথের ভিখারী হইতেছেন। যাঁহার নিকট পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি জ্ঞানলাভের জন্য একসময় দ্বারস্থ ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণই পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী ; আমাদের স্বীয় কর্ম্মফলই এই দশা-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, ভো বিড়ম্বনা !! ভূদেব ব্রাহ্মণবর্গ ! আপনারা সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করুন নতুবা আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। বর্ত্তমান

ধর্ম্মহীন, সংযম ও ব্রাহ্মণ্যহীন শিক্ষাপ্রণালী আমাদের অধঃপতনেরই অন্যতম কারণ, ইতঃপর সমাজ-শক্তির খর্ব্বতা এবং অন্যান্য প্রতিকূল কারণ-সমবায় এই দশাবিপর্য্যয়ের হেতু বটে। ব্রহ্মচর্য্য পালন ব্যতীত প্রকৃত মনুষ্যত্ব উন্মেষিত হইতে পারে না। হিন্দুর চতুরাশ্রম অতি সুচিন্তিত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ বর্ণনকালে চতুরাশ্রমের একটী সুন্দর আভাস দিয়াছেন, তাহা এই :— "শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং। বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্, রঘুনামন্বয়ং বক্ষ্যে" ইত্যাদি। ইহাই মানবজীবনের স্বাভাবিক বিভাগ; এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিভাগ আর কখনই কল্পনা করা সম্ভবপর নহে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অপব্যবহারই যে আমাদের অধঃপাতের মূলীভূত কারণ, তাহা বোধ হয় আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" এবং "রেতো বৈ ব্রহ্ম" এই কথাগুলির মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের বলহানি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হ্রাস হইতেছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" অষ্টবিধ মৈথুন বর্জ্জনই ব্রহ্মচর্য্যব্রত। "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং ব্রহ্মষিভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥" বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মসমূহ সর্ব্বদা পালন করা সম্ভবপর না হইলেও কতকটা পালন করা যাইতে পারে এবং ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে জীবন গঠনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। কি উপায়ে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ

পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তনীয়। আর্য্য ঋষিগণ দ্বিজাতির পক্ষে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের) চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বাস করতঃ বিদ্যাভ্যাস ও বেদাধ্যয়নের কালই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের জন্য এই আশ্রমের কাল ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। অধুনা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, অন্ততঃ বঙ্গদেশে, তিন দিনেই শেষ হয়। কোন কোন স্থলে ইহা তিন ঘণ্টায়ই শেষ হয়; কোথাও বা ইহা একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। ইতঃপরই গার্হস্থ্যাশ্রম আরম্ভ হয়। মনু গার্হস্থ্যাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কারণ গার্হস্থ্যাশ্রম ভিন্ন পঞ্চমহাযজ্ঞ সাধিত হইতে পারে না; বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, অতিথিসেবা, বলিকর্ম্ম (পশু পক্ষীকে আহার দান), পিতৃতর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি যথাক্রমে ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ নামে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্বারাই মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়; নতুবা সে পশুভাবাপন্ন হয়। মনু বলিতেছেন :—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥

ব্রহ্মচর্য্যের পর সমাবর্ত্তনান্তে দার পরিগ্রহ গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্য। বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধানগুলি এত সুন্দর পবিত্র ও সুচিন্তিত যে, জগতের কোন জাতির বিবাহবিধিই ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে আমরা বর্ত্তমান সময়ে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া, শাস্ত্রবিধি অনায়াসে উল্লঙ্ঘন

করতঃ সমাজে কতকগুলি অতি ঘৃণিত ও যথেচ্ছ আচার ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করিয়াছি ও করিতেছি। পণগ্রহণ প্রথা তন্মধ্যে একটী অতি গুরুতর অনিষ্টজনক; ইহার মাত্রা ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, সত্বর ইহার গতিরোধ করিতে না পারিলে পরিণাম ভয়াবহ। সমাজে তাহার অশুভফল প্রত্যহই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তথাপি আমরা তাহার কোনও প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছি না বা করিতে পারিতেছি না। কেবল মাত্র সভাসমিতি ও বক্তৃতাদ্বারা এই ঘৃণিত প্রথা সমাজ হইতে উন্মূলিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতঃ সুমীমাংসায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিবেন। অতঃপর অনেক প্রকার অশাস্ত্রীয় বিবাহও সমাজে অবাধে প্রচলিত হইতেছে। বংশ পরিচয় প্রভৃতির অসদ্ভাবই এই প্রকার দুর্ঘটনার মূলীভূত কারণ। পূর্ব্বে কুল-পুরোহিতগণই বংশপরিচয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধাবস্থায় রাখিতেন। সম্প্রতি তাঁহাদের ব্যবসা প্রায় বিলুপ্ত। আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে সমাজ ক্রমেই হীনদশা প্রাপ্ত হইবে এবং পরিণামে জাতির ধ্বংশ হইবে। সামাজিক সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় বিবাহ ব্যবস্থা; কারণ বিবাহই সমাজবন্ধনের মূল সূত্র, এবং ইহার পবিত্রতা রক্ষার উপরই সমাজের স্থিতি ও গতি নির্ভর করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বিবাহ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সমাজকে চালিত করার চেষ্টা করা সমীচীন।

অভিভাষণের প্রারম্ভে ব্রহ্মণ্য দেবকে নমস্কারোপলক্ষে তাঁহাকে 'গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ' বলা হইয়াছে; কিন্তু জানি না আমাদের কোন্

মহাপাতকের ফলে তিনি অধুনা তত্তদ বধায় হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে যে প্রকার প্রতিকূল লক্ষণ সমূহ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় গো ব্রাহ্মণ অচিরাৎ ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন:—

"ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতং।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥"

গো ও ব্রাহ্মণ এক কুলেই উৎপন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, একে (ব্রাহ্মণে) মন্ত্র এবং অন্যত্র (গোতে) হবি (ঘৃত) অবস্থান করিতেছে। "হবির্বৈব্রহ্ম" ঘৃতই ব্রহ্ম, একথার মূলেও গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে "গোভির্ন তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ" অপরঞ্চ "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ"। বস্তুতঃ ভারতের প্রধান সম্পত্তিই গো এবং গোরক্ষাতেই ভারত রক্ষিত। গোজাতির অবনতিতে যে ভারতের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে। গোজাত দুগ্ধাদিই আমাদের প্রধান জীবনীয় পদার্থ; গোজাতির অবনতি ও বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই দুগ্ধ, নবনীত প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের অসদ্‌ভাব ঘটিতেছে, তাহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইতেছে! ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; হলচালনা, ভারবহন ও শকটাদি চালনের প্রধান সহায় গো, অতএব গোজাতির হীনতায় ভারতে কৃষি বাণিজ্যের অন্তরায় ঘটিতেছে। ক্ষেত্রের প্রধান সার গোময়ের ন্যায় আর কিছুই নাই; তাহার অপ্রচুরতায় ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তির হানি হইতেছে। শাস্ত্রে গোমূত্র ও গোময় অতি পবিত্র পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"শক্বন্মূত্রং পরস্তাসামলক্ষ্মীনাশনং পরম্" ইহা ধ্রুবসত্য এবং বর্ত্তমান সময়ের ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

এক কথায় বলিতে গেলে গভীর অবনতিতে ভারতের স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই অবনতি হইতেছে। গোবংশ লোপের কতকগুলি প্রধান কারণ এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১ম—গোপালনের প্রতি অশ্রদ্ধা।

২য়—গোচারণ ক্ষেত্রের ক্রমে অসদ্ভাব।

৩য়—গো মড়ক (বসন্ত, গলা ফোলা প্রভৃতি) সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব।

৪র্থ—গোবংশ রক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট বীজসেক্তা ষণ্ডের অভাব।

৫ম—যথেচ্ছা গোবধ।

৬ষ্ঠ—চর্ম্ম ব্যবসায়ের আধিক্য হেতু চর্ম্মকার কর্ত্তৃক বিষ-প্রয়োগে গোবধ।

৭ম—গো চিকিৎসা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।

ইতঃপর আরও অনেক প্রতিকূল কারণে গোবংশ ক্রমে ধ্বংশোন্মুখী হইতেছে। উপরোক্ত কারণ পরম্পরার মধ্যে যেগুলির প্রতিবিধান আমাদের পক্ষে সম্ভবপর তাহা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন এ বিষয়েও মনোযোগী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈন সম্প্রদায়ের অনুসরণে দেশের সর্ব্বত্র পিঞ্জরাপোলের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; অবশ্য এই কার্য্য বহুব্যয়সাপেক্ষ। সরল বঙ্গভাষায় গোচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া বিধেয়। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ভারতের নানা স্থানে পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করতঃ প্রজাবর্গের অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়া-

ছেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত পশুচিকিৎসালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলের পক্ষে সহজ লভ্য নহে; অতএব যাহাতে অল্প ব্যয়ে দরিদ্র কৃষক সমূহ গোচিকিৎসার সহায়তা পাইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি গোরক্ষা কল্পে ২।৪টী অতিরিক্ত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম; শ্রোতৃবৃন্দ ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন "গো ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলেই কি সমগ্র সমাজ ও দেশ উন্নত হইল"? প্রকৃতই গো ব্রাহ্মণ রক্ষার উপরই ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল নির্ভর করে। এই দুইটী রক্ষিত হইলেই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ থাকিবে, নতুবা ইহা ভোগ ভূমিতে পরিণত হইবে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে "ভারতঃ কর্ম্মভূমিস্ত অন্যে তু ভোগভূময়ঃ" ভারতবর্ষ যাহাতে ভোগভূমি না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। গো ব্রাহ্মণ রক্ষার উপর এত অধিক কথা বলাতে কেহ যেন মনে না করেন যে আমি অশ্ব ও অন্যবিধ গৃহপালিত পশ্বাদি রক্ষা বিষয় অবহেলা করিতে বলিতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত অনেকের মুখেই শুনিতে পাই যে ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা এবং শূদ্রের প্রতি অত্যাচার ও শাস্ত্রীয় কঠোর বিধি ব্যবস্থাই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়া থাকেন যে "ব্রাহ্মণ অতি স্বার্থপর ছিলেন, তাঁহারা কাহাকেও জ্ঞান বিতরণ করিবার ইচ্ছা করিতেন না এবং শূদ্রের প্রতি অসম্ভব নিষ্ঠুরতা করিতেন"। শাস্ত্রানভিজ্ঞতাই এই ভ্রান্ত ধারণার মূলীভূত কারণ। সত্য বটে, পূর্ব্বতন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ স্ত্রীজাতি ও শূদ্রকে বেদ পাঠের অধিকার দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই, কিন্তু

তাহাদের অন্য প্রকার শিক্ষালাভের কোনও বাধা শাস্ত্রে কোথায়ও উক্ত হইয়াছে কি? আমার বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, স্ত্রী ও শূদ্রের শিক্ষার অতি প্রকৃষ্ট উপায়ই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় সমাজের একদিক (পুরুষভাগ) নিয়ত জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বল হইবে, অন্যদিক্ (স্ত্রীভাগ) গাঢ়তম অজ্ঞান তমসাবৃত থাকিবে, ইহা আর্য্যঋষির কল্পনায় আসে নাই। প্রাচীনভারতের সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী প্রভৃতি অশিক্ষিতা ছিলেন, এই কথা যাঁহারা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে আমি অক্ষম। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন দেশকালোচিত স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিতেও চেষ্টা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু রমণীর শিক্ষা বর্ত্তমানে যে ভাবে দেওয়া হইতেছে, তাহা ততটা মঙ্গলজনক হইবে কিনা তৎপক্ষে গভীর সন্দেহ আছে। কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ ইহাও ঋষি বাক্য বটে। যে শিক্ষা দ্বারা হিন্দু রমণীর মাতৃত্বের ও অন্যান্য সদ্‌গুণ বিকাশের বিঘ্ন ঘটে, সে শিক্ষা অন্তঃপুরের ত্রিসামা স্পর্শ না করিতে পারে, তৎপক্ষে তীব্র দৃষ্টি রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আমার বিবেচনায় আবশ্যক মত যাহাতে শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি সহজে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, তাহার উপায় করাও ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের অন্যতম কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত দেবভাষা, এই ভাষার রত্নভাণ্ডারে যে কত অমূল্য ভাস্বর রত্ন লুক্কায়িত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমাদের রত্নভাণ্ডার হইতে বৈদেশিকগণ কত রত্ন আহরণ করিয়া ধনী হইতেছেন, আর আমরা অবহেলায় তাহা হারাইতেছি, ইহা

বড়ই পরিতাপের বিষয়। অতএব সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দেশে যত প্রসারিত হইবে ততই কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে। বেদের পঠন পাঠন বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে ; অতএব যাহাতে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচারিত হয়, তাহারও চেষ্টা করা সমীচীন, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে "বেদাধীনা জগৎ কৃৎস্নং" ইত্যাদি।

এস্থলে আরও একটী কথা বক্তব্য এই যে টোলগুলিতে ব্যবহারিক বিদ্যারও যথাসম্ভব আলোচনা প্রবর্ত্তিত হওয়া সঙ্গত, অর্থাৎ জড়বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিদ্যারও কথঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া সঙ্গত। এগুলি বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ সাহায্যেই হওয়া সুবিধাজনক মনে করি। যদি পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সরল সংস্কৃতভাষায় পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করিতে পারেন, তবে বড়ই মঙ্গল হয় ; অতএব এ সম্বন্ধে চেষ্টা করা সঙ্গত। যে সমস্ত অধ্যাপকগণ ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় কৃতবিদ্য তাঁহারাই এবম্বিধ চেষ্টায় সহজে সফল-কাম হইতে পারেন। প্রাচীন ভারতের ঋষি সম্প্রদায় যদিও ব্রহ্ম-বিদ্যাকেই **পরাবিদ্যা** নামে অভিহিত করিয়াছিলেন (পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে) এবং অপর সর্ব্ববিধ বিদ্যাকে **অপরা বিদ্যা** সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ইহলৌকিক উন্নতি বিধায়ক আয়ুর্ব্বেদ (মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ), গণিত, জ্যোতিষ, শিল্পশাস্ত্র, গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত শাস্ত্র), ধনুর্ব্বেদ, বাস্তুবিদ্যা চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনাতেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ লৌকিকালৌকিক, কোনও বিদ্যাই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের

জ্ঞানের অবিষয়ীভূত ছিল না। বর্ত্তমানকালেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করিলেই ইহপারলৌকিক সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারেন। তাঁহাদের প্রতিভা ও বুদ্ধি অতি প্রখর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আর কেবলমাত্র এক শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা ব্যবহারিক কৃতিত্বলাভ সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদ্যাচতুরস্র হওয়া সঙ্গত, নতুবা তাঁহাদের গৌরবহানি হইবে। "এক বিদ্যা সুশিক্ষিতা" একথা যথার্থ হইলেও, সর্ব্ব শাস্ত্রে গতি থাকা প্রয়োজন। অবশ্য পল্লবগ্রাহী বিদ্যা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। পাশ্চাত্যজাতি সমূহ এখন নানাবিধ লৌকিক বিদ্যায় সমুন্নত ও তাঁহাদের অধ্যবসায় এবং জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা অতি বলবতী। তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট হইতে পূর্ব্বতন ঋষিগণ জ্যোতিষতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং" ইহা তাঁহাদেরই কথা। তাঁহাদের ইহাও মত যে

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

ভগবান্ মনু বলিতেছেন :—

"স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মং শৌচং সুভাষিতং।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥"

অতএব যে কোন জাতি হইতে অথবা যে কোন ব্যক্তি হইতে জ্ঞান আহরণে কোনও দোষের কারণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কখনও সঙ্কীর্ণমনা হইতে পারেন না; ব্রাহ্মণত্ব ও অনুদা-

রতা, পরস্পর বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত। "চণ্ডালমপি বিত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ" ইহা ব্রাহ্মণেরই উক্তি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অথবা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী মানুষের গন্তব্য পন্থা। ব্রাহ্মণ নিবৃত্তি বা শ্রেয়ঃ পথকেই অবলম্বন করতঃ মোক্ষলাভের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ফলতঃ কেবলমাত্র প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া চলিলে মনুষ্যত্বের হানি হইবে। ত্যাগের মধ্যে ভোগকে গ্রহণ করাই ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক। নির্দ্বন্দ্বতা, নির্লোভতা, এবং নির্ম্মৎসরতাই ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রকৃত ব্রাহ্মণের নিকট "বসুধৈব কুটুম্বকম্" "অয়ং নিজো পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।" তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও জলোৎসর্গের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মণের হৃদয় কত উচ্চ, কত উদার, কত নির্ম্মল ছিল। ভগবান্ মনু অতি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন :—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

এই উক্তি কখনও উন্মত্তপ্রলাপ নহে, ইহা নিষ্ফলা নহে, ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, সমগ্র জগৎ আজ ভারতীয় ঋষির জ্ঞানের নিকট ক্রমে অবনত-মস্তক হইতেছেন। ভারতীয় ঋষির চরণে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানদৃপ্ত জাতিসমূহ সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। বেদান্ত দর্শনের গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়াছে। "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং" ভগবান শঙ্করাচার্য্যের এই গম্ভীর বাণী আজ জগতের

দিক্ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সনাতন বেদবাক্য সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অচিরেই পাশ্চাত্য জগতে গভীর সত্য বলিয়া আদৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; আমরা ভারতের ঋষিবংশ সম্ভূত একথা যেন ভুলিয়া না যাই। পিতৃপুরুষের বহু আয়াসলভ্য অতুল সম্পত্তি হেলায় হারাইলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া কেবলমাত্র আস্ফালনে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি উপহাসাস্পদ হইবেনই। সত্য কথা বলিতে কি, হংসমালা যেমন শরৎকালে স্বতই গঙ্গাভিমুখে প্রধাবিত হয়, মহৌষধি যেমন নিশাকালে স্বয়ংই দীপ্যমান হয়, লৌহ যেমন স্বভাবতঃই অয়স্কান্তমণির দিকে আকর্ষিত হয়, যোগবলে বলীয়ান্, বেদপরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, (মনু বলিতেছেন—"শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ, ভুক্ত্বা, ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ। ন হৃষ্যতি গ্লায়তি চ স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥") সংযমী ও প্রশান্তচেতা, পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত জগৎবাসী জ্ঞানার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইবেই। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ! আপনারা স্বীয় শক্তির অপব্যবহার করিবেন না এবং সামান্য অর্থলোভে পরমার্থ হারাইবেন না, আপনারা স্মরণাতীত কাল হইতেই জগতের শিক্ষাগুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন একথা ভুলিয়া যাইবেন না। উপসংহারে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, পারস্পরিক দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি ভুলিয়া, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করতঃ আপনারা সকলে মিলিত ভাবে ব্রাহ্মণের এবং তৎসহ চতুর্বর্ণ বিশিষ্ট সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসমাজের হিত কামনায় নিখিল জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং শক্তি নিয়োজিত করুন, ব্রহ্মণ্য দেব হইয়া জগতের সমক্ষে

উন্নত শিরে প্রশান্ত ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবেন। যাহা সনাতন তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না, নষ্ট হইলে আর তাহা সনাতন হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞাত সনাতন এবং ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন-ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, অতএব ব্রাহ্মণও সনাতন। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার এই ক্ষুদ্র অভিভাষণে কোন অসম্বন্ধ উক্তি থাকিলে, অথবা কোন প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে গভীর ও অতি পবিত্র বেদবাণী উচ্চারণ করিতেছি ;—

"সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসত ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ
সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং কে তো অভিসংরভধ্বং সংজ্ঞানেন বো
হবিষা যজামঃ ॥
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুমহাসতি ॥
সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনাবহধীতমস্তু মা বিদ্বিধাষহৈ !"

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।